ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ধারা

ইউনিট ১

বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বিকাশে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব অনস্বীকার্য। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে গোড়াপত্তন হওয়া ব্রিটিশ শাসন কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনেনি, এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছে। এ শাসন ১৭৫৭ থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ একশত নব্বই বছর বহাল ছিল। অনেক আন্দোলন সংগ্রাম, সংস্কার ও রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, ইলা মিত্রের মতো বিপ্লবীরা যেমন রক্ত দিয়েছে তেমনি ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো অনেক নেতারও জন্ম দিয়েছে। সমাজ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে অনেক নতুন রীতি-নীতি, আইন ও পদ্ধতি। আলোচ্য ইউনিটে পলাশীর যুদ্ধ, ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা, ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন, রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনসমূহ তুলে ধরে ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১: পলাশীর যুদ্ধ ও কোম্পানি শাসন	পাঠ-১১: খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন
পাঠ-২: সশস্ত্র প্রতিরোধ	পাঠ-১২: বেঙ্গল প্যাক্ট, ১৯২৩
পাঠ-৩: সিপাহী বিদ্রোহ	পাঠ-১৩: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন
পাঠ-৪: ভারতীয় কাউন্সিল আইন	পাঠ-১৪: বঙ্গীয় আইন সভা
পাঠ-৫: ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	পাঠ-১৫: লাহোর প্রস্তাব
পাঠ-৬: বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদ	পাঠ-১৬ : ক্রিপস ও মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা
পাঠ-৭: মুসলিম লীগ	পাঠ-১৭ : ভারত স্বাধীনতা আইন
পাঠ-৮: মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন	পাঠ-১৮: স্বাধীন অখন্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ
পাঠ-৯: 'লক্ষ্ণৌ' চুক্তি, ১৯১৬	পাঠ-১৯ : ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল
পাঠ-১০: মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন	

পাঠ-১.১ পলাশীর যুদ্ধ ও কোম্পানি শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির আগমন ও কোম্পানির শাসন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পলাশীর যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ঢাকার বাণিজ্য কুঠি, দস্তক, সমন্দ, পলাশী প্রান্তর, মীরজাফর, স্বাধীনতার সূর্য।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির আগমন

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হয়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশদের একটি বণিক সংঘ। ১৬০০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটেনের রাণী এলিজাবেথ ২১৭ জন বণিককে এই প্রাইভেট জয়েন্ট স্টক কোম্পানি গঠন করার সনদ (charter) প্রদান করেন। এই কোম্পানিকে ভারত ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটেনের পক্ষ থেকে ব্যবসা করার একচেটিয়া অধিকার দেয়া হয়। ইংরেজদের এ অঞ্চলে আগমনের পূর্বেই পর্তুগিজ, ফরাসি ও ওলন্দাজরা এদেশে বাণিজ্য শুরু করে। বাণিজ্য সংক্রান্ত আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এদের সঙ্গে ইংরেজদের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ হয়। শেষ অবধি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে বাণিজ্যিক আধিপত্য বিস্তারের পাশাপাশি নিজেদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত করতে সক্ষম হয়।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের প্রথম বাণিজ্য কুঠি ভারতের পশ্চিম উপকূলে বন্দর সুরাতে (১৬১৩ খ্রি:) স্থাপন করে। এর প্রায় বিশ বছর পর ১৬৩৩ সনে কোম্পানি নামে মাত্র বাংলার সঙ্গে বাণিজ্য উদ্বোধন করে। তবে এ অঞ্চলে বাণিজ্য লাভজনক না হওয়ায় কোম্পানি এ নিয়ে প্রথম বিশ বছর বেশ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকে। পরবর্তীতে কোম্পানি ১৬৫০ সনে বাংলায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৬৫১ সালে হুগলীতে স্থাপন করে প্রথম বাণিজ্যকুঠি। এই ঘটনাকে বাংলায় ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার পথে পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল ১৬৮৬-৯০ সালে এ্যাংলো-মুঘল যুদ্ধ, এর পর সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক বাৎসরিক থোক তিন হাজার টাকা শুল্ক প্রদানের শর্তে বাংলায় অবাধ বাণিজ্য করাসহ কোম্পানি প্রতিনিধি জব চার্নককে সুতানুটিতে বসতি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা। ১৬৯৮ সনে কোম্পানিকে কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর নামক তিনটি গ্রামের জমিদারি সনদ প্রদান করা এবং কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ১৭১৭ সালে সম্রাট ফররুখ শিয়ার কোম্পানিকে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করে। মাদ্রাজ, বোম্বে ও কলকাতাকে কেন্দ্র করে কোম্পানির বাণিজ্য দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে।

পলাশীর যুদ্ধ ও কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠা

১৭১৭ সালের বাদশাহী ফরমান নবাব ও কোম্পানির মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশ শীতল করে তোলে। নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর তার দোহিত্র সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের মসনদে আরোহণ (১০ এপ্রিল, ১৭৫৬) করেন এবং কোম্পানির প্রতি তাঁর নীতি ঘোষণা করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, ইংরেজদের উপস্থিতি এ দেশের স্বার্থের প্রতিকূল।

ইংরেজদের বাংলা থেকে বিতাড়নে তিনটি কারণ নিম্নরূপ

প্রথমত, দেশের প্রচলিত আইন-কানুন অমান্য করে কলকাতার দুর্ভেদ্য দুর্গ ও পরিখা স্থাপন।
দ্বিতীয়ত, বেআইনীভাবে কোম্পানির নামে ব্যক্তি পর্যায়ে দস্তক (বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার পাশ) বিতরণ করে সরকারকে বৈধ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করা এবং তৃতীয়ত, জমিদারি ইজারার নিয়ম ভঙ্গ করে ইংরেজদের কলকাতা জমিদারীকে নিজেদের সার্বভৌম এলাকা হিসেবে গণ্য করা ও নবাবি আইন-আদালত থেকে পালিয়ে আসা অনেক অপরাধীকে কলকাতায় কোম্পানি কর্তৃক আশ্রয় প্রদান।

কোম্পানির প্রতি নবাবের ঘোষিত নীতির কারণে ইংরেজদের সাঙ্গে নবাবের বেশ কয়েক দফা যুদ্ধ ও শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। বস্তুত সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করার পর থেকে তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে নানা কারণে মন:ক্ষুন্ন ঘরের শত্রু শওকত জং, ঘষেটি বেগম দরবারের শত্রু আমাত্য ও বেনিয়া সম্প্রদায় এবং বহি:শত্রু ইংরেজদের সঙ্গে। নবাবের অভ্যন্তরীণ শত্রুদের কাজে লাগিয়ে ইংরেজরা নবাবকে উৎখাতের এক নীল নকশা তৈরি করে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বাধীন ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে নবাবের বাহিনীর এক যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। তবে একে যুদ্ধ না বলে পাতানো খেলা বলা ভালো। কারণ যুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে প্রধান সেনাপতি মীর জাফরের নেতৃত্বাধীন অধিকাংশ সৈন্য নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে, যার ফলে নবাবের পরাজয় ঘটে। বন্দী অবস্থায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবকে।
পলাশীর যুদ্ধের দুই ধরণের ফলাফল আছে; প্রথমত অব্যবহিত ফলাফল এবং দ্বিতীয়ত সুদূর প্রসারী ফলাফল। পলাশী যুদ্ধের পরপরই এ অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। ইংরেজরা চরম লুণ্ঠনযজ্ঞ চালাতে থাকে, বাংলার সম্পদ পাচার

হতে থাকে। ইংরেজরা স্থানীয় ব্যবসায় যোগদান করে, যার ফলে বাংলার অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়। অপরদিকে, পলাশী যুদ্ধের সুদূর প্রসারী ফলাফল ছিল রাজনৈতিক। পলাশীর পরিণতিতে বাংলার প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে এবং ভিত্তি রচিত হয় নতুন প্রতিষ্ঠানে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের।

পলাশী যুদ্ধের পর ষড়যন্ত্র মোতাবেক মীর জাফর বাংলার নবাব হন। কিন্তু মাত্র তিন বছর পর তিনি নিজ জামাতা মীর কাশিমের ষড়যন্ত্রের শিকার হন এবং নবাবী হারান। মীর কাশিম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সিংহাসনে আরোহণ করলেও দেশের স্বার্থে কাজ করা শুরু করেন। ফলশ্রুতিতে ইংরেজদের সাথে তাঁর যুদ্ধ (১৭৬৩) হয় এবং যুদ্ধে পরাজিত হলে তাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। এরপর আবার নবাব হন মীর জাফর। মূলত ইংরেজরা পুতুল নবাব পছন্দ করতেন, কোনো স্বাধীনচেতা নবাব তাদের পছন্দ ছিল না। কোম্পানি সরাসরি শাসনভার হাতে না নিলেও দেশীয় রাজার মসনদে থাকা না থাকা ছিল তাদের ইচ্ছার ব্যাপার। এভাবে পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানিই দেশের শাসনকর্তা হয়ে ওঠে। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের একচ্ছত্র আইনগত ক্ষমতা লাভ করে। ১৭৭২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত 'রেগুলেটিং এ্যাক্ট' এর মাধ্যমে ওয়ারেন হেস্টিংসকে গভর্ণর জেনারেল এবং চার সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টামণ্ডলীর বিধান করে কলকাতায় সর্বপ্রথম কোম্পানি একটি কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এরপর ধীরে ধীরে এই কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রসারিত হয়। ১৮৫৮ সালে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে এবং এর স্থলে ব্রিটিশ রাণীর সরাসরি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পলাশী যুদ্ধের সুদূর প্রসারী ফলাফল বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা জড়িত হয় মূলত বাণিজ্যিক স্বার্থে। বাংলা তথা ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে যোগদান করতে এসেছিল ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজসহ নানান ইউরোপিয় দেশের বণিকেরা। তারা স্থানীয় শাসক ও বণিকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। ইংরেজ বণিকেরা বাণিজ্যের পাশাপাশি স্থানীয়দের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে বাংলার নবাবকে মসনদ থেকে উৎখাত করে। বাণিজ্য রূপান্তরিত হয় রাজনৈতিক আধিপত্যে। স্থাপিত হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পলাশীর যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?

(ক) ১৭৫৭ সালে (খ) ১৮৫৭ সালে (গ) ১৯০৫ সালে (ঘ) ১৯৪৭ সালে

২। ব্রিটিশ ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান হয় কত সালে

(ক) ১৭৫৪ সালে (খ) ১৭৫৭ সালে (গ) ১৮৫৮ সালে (ঘ) ১৮৫৭ সালে

৩। মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করায়–

(i.) বাংলার নবাব ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন

(ii.) কোম্পানি সরাসরি প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের অধিকার পায়

(iii.) কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.২ সশস্ত্র প্রতিরোধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে সংগঠিত বিভিন্ন প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- হাজী শরীয়তুল্লাহ্, দুদু মিঞা ও তিতুমীরের সশস্ত্র প্রতিরোধ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ভূমি রাজস্ব, ব্রিটিশ বিরোধী, ফরায়েজী, নির্যাতন, লাঠিয়াল বাহিনী, কুসংস্কার, বাঁশের কেল্লা

ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র প্রতিরোধ

ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নেয়াটাই ছিল ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রাথমিক যুগের শাসনের অন্যতম লক্ষ্য। মূলত একটি বাণিজ্যিক সংস্থা হিসেবে কোম্পানির অভিজ্ঞতা ছিল বাণিজ্য বিষয়ে সীমাবদ্ধ। দেশ শাসন সম্পর্কে কোম্পানির কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে শাসন সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার উর্বরতম ক্ষেত্র ছিল ভূমি রাজস্ব শাসন। তাদের শাসন-শোষণে চিরায়ত গ্রামীণ সমাজ কাঠামো দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছিল। কৃষকের উদ্বৃত্ত আত্মসাতের জন্য কোম্পানি সরকার শশব্যস্ত থাকলেও খরা, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। শুধু তাই নয় কৃষকদের জন্য অলাভজনক হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজ ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে কৃষকদের নীল ও লবণ চাষে বাধ্য করা হত। এমতাবস্থায়, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে একের পর এক বিদ্রোহের জন্ম হয়। এর মধ্যে ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৭০-১৭৯০), রংপুর কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩), সন্দ্বীপ বিদ্রোহ (১৭৬৪), চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৭-৮৭), যশোর-খুলনার প্রজা বিদ্রোহ (১৭৮৪-১৭৯৬), পাগলাপন্থা বিদ্রোহ (১৮২৩-১৮৩৩), ফরায়েজী আন্দোলন (১৮২০-১৮৫৭), নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০), পাবনা কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭২-১৮৭৩) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আঠার-উনিশ শতকে বাংলার এই বিদ্রোহগুলো ছিল প্রাক-রাজনৈতিক, কেননা এগুলো ছিল মূলত ধর্মীয়, অপরিকল্পিত, অসংগঠিত, এবং স্বত:স্ফূর্ত। তবে সীমাবদ্ধতা স্বত্তেও এসব বিদ্রোহ আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে ফরায়েজী আন্দোলন ও তিতুমীরের কৃষক বিদ্রোহ

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় বিভিন্ন সময় ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন সংগ্রাম সংগঠিত হয়। এরূপ বিদ্রোহের মধ্যে ফরায়েজী আন্দোলন ও তিতুমীরের নেতৃত্বাধীন কৃষক বিদ্রোহ ছিল অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাথমিকভাবে এ আন্দোলনগুলো ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও পরবর্তীতে তা ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। মুসলমানদের পাঁচটি ফরয কাজের উপর গুরুত্বারোপ করে ফরায়েজী আন্দোলনের সূচনা। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হিসেবে ফরায়েজী আন্দোলন শুরু করেন। পরবর্তীতে তাঁর সন্তান মুহাম্মদ মহসীন উদ্দীন ওরফে দুদু মিয়ার (১৮১৯-১৮৬২) নেতৃত্বে দ্রুত এটি কৃষক আন্দোলনে পরিণত হয়।

হাজী শরীয়তুল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন

হাজী শরীয়তুল্লাহ্ ১৭৮১ সালে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার বাহাদুরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলামী শিক্ষায় সুপন্ডিত ছিলেন। ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ১৮ বছর বয়সে মক্কা গমণ করেন এবং ২০ বছর সেখানে অবস্থান করেন। দেশে ফিরে তৎকালীন মুসলমান সমাজের দুরাবস্থা দেখে তিনি খুবই ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন হন। এমতাবস্থায়, তিনি মুসলমান সমাজকে "শুদ্ধকরণের" যে আন্দোলন শুরু করেন তা ফরায়েজী আন্দোলন নামে পরিচিতি। এছাড়াও তিনি প্রজাসাধারণের উপর চলে আসা সকল শোষণ, বঞ্চণা ও নির্যাতন রুখে দাঁড়ানোরও আহবান জানান। তাঁর নেতৃত্বে এ আন্দোলন দ্রুত ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন

হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর তাঁর পুত্র দুদু মিঞা ফরায়েজী আন্দোলনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ফরায়েজী আন্দোলনকে একটি সুবিন্যস্ত ও শক্তিশালী সাংগঠনিক রূপ দেন। ফরায়েজী আন্দোলনভূক্ত সমগ্র অঞ্চলকে তিনি কয়েকটি সার্কেলে বিভক্ত করেন। প্রত্যেকটি সার্কেল দেখাশুনার দায়িত্বভার একজন খলিফা বা প্রতিনিধির উপর ন্যস্ত করা হয়। অত্যাচারী জমিদার নীলকরদের মোকাবেলায় একটি সুশৃংখল লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। জমিদার-নীলকরদের সঙ্গে দুদু মিয়ার বাহিনীর বেশ কয়েকবার সরাসরি সংঘর্ষ বাঁধে। এর মধ্যে ১৮৪৬ সালে মাদারীপুরের ইংরেজ নীলকর ডানলপের সাথে সংঘর্ষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় দুদু মিয়াকে বন্দী করা হয়। পরবর্তীতে মুক্তিলাভ করে তিনি ঢাকায় বসবাস শুরু করেন। ১৮৬২ সালে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

তিতুমীরের কৃষক বিদ্রোহ

মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিতুমীর প্রথম জীবনে নদীয়া জেলার জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীতে তিনি হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় যান। সেখানে গিয়ে ওহাবী আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদ বেরেলভির সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁর মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হন।

তিতুমীর দেশে ফিরে একদিকে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন অপরদিকে জমিদার, নীলকর ও ব্রিটিশ বাহিনীর নির্মম অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। শীঘ্রই পশ্চিম বাংলার বিশাল অঞ্চল জুড়ে তিতুমীরের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। অত্যাচারী নীলকর, জমিদার ও ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে একাধিক জায়গায় তিতুমীরের বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। চূড়ান্ত সংঘর্ষ বাঁধে বারাসাতের অদূরে নারিকেলবাড়িয়া নামক স্থানে। সেখানে তিতুমীর বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে শাসকগোষ্ঠির আক্রমণের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত কর্ণেল সুয়ার্টের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ বাহিনীর কামানের গোলার আঘাতে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এ সম্মুখ যুদ্ধে ৫০ জন সহযোদ্ধাসহ তিতুমীর শহীদ হন। এভাবে তিতুমীরের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	তিতুমীরের সশস্ত্র প্রতিরোধের মূল্যায়ন করুন।

সারসংক্ষেপ

কোম্পানির দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানায় প্রায় সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ। বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন কারণ ছিল। শুরুর দিকের প্রতিরোধ সংগ্রামের একটি সাধারণ লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাত করা। যদিও এ সকল প্রতিরোধ-সংগ্রাম ছিল বিক্ষিপ্ত ও আঞ্চলিক। তথাপি এ সমস্ত আন্দোলন পরবর্তীতে সকল ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতা ছিলেন-

(i) হাজী শরীয়তুল্লাহ

(ii) তিতুমীর

(iii) নবাব আব্দুল লতিফ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। দুদু মিয়ার পুরো নাম কী?

(ক) নেসার আলী (খ) মুহাম্মদ মহসীন উদ্দীন

(গ) মীর লতিফ (ঘ) শওকত বেগ

পাঠ-১.৩ সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮৫৭

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ বা প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বিদ্রোহী পরবর্তী অবস্থায় ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্বাধীনতা সংগ্রাম, শোষণ-বঞ্চনা, অসম্মান, লুণ্ঠনযজ্ঞ, কালাপানি, স্বত্ব-বিলোপ, মঙ্গল পান্ডে, ভাইসরয়।

সিপাহী বিদ্রোহ

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ব্রিটিশদের প্রায় দু'শ বছরের শাসনামলে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম সংগঠিত হয়। শুরুর দিকের আন্দোলন-সংগ্রাম ছিল বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন এবং এগুলো খুব বেশী সফলতার মুখ দেখেনি। কিন্তু ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ব্রিটিশদের এ অঞ্চল সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। অনেক ঐতিহাসিক 'সিপাহী বিদ্রোহ'কে ভারতীয় ইতিহাসের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে অভিহিত করেছেন।

সিপাহী বিদ্রোহের কারণসমূহ

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ কোন একক কারণে হয়নি। ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পরে কোম্পানির একশ বছরের অত্যাচার, শোষণ ও বঞ্চনার প্রতিবাদ হল সিপাহী বিদ্রোহ। বিভিন্ন কারণে সিপাহী বিদ্রোহ সংগঠিত হয়, নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হল :

- **রাজনৈতিক কারণ :** কোম্পানির বিভিন্ন কার্যকলাপ ও পদক্ষেপ এ দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস করে। লর্ড ডালহৌসীর 'সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি ও স্বত্ব বিলোপ নীতি' দ্বারা দেশীয় অনেক নবাব ও রাজা তাদের রাজ্য হারান। কুশাসনের অভিযোগে অযোধ্যা ও নাগপুর রাজ্য দখল করে নেয়া হয়। তাছাড়া বিভিন্ন উপায়ে মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে অপমাণিত ও অসম্মান করা হয়।
- **অর্থনৈতিক কারণ :** কোম্পানির একশ বছরের শাসনে এ অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে নাজুক হয়ে পড়ে। কোম্পানি প্রবর্তিত নতুন ভূমি ও খাজনা নীতি যেমন কৃষকদের ভূমিহীন করেছিল তেমনি অনেক জমিদারও তাদের জমিদারি হারান। ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। তাছাড়া কোম্পানি এদেশ থেকে মূল্যবান ধাতু ও ধনসম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার করতে থাকে। কোম্পানির এ লুণ্ঠনযজ্ঞ অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে।
- **সামরিক কারণ :** কোম্পানির সামরিক বাহিনীতে ৮৭ ভাগ ছিল দেশীয় সিপাহী। তথাপি ভারতীয় ও দেশীয় সৈন্যদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদির ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য ছিল। দেশীয় সৈন্যরা সর্বোচ্চ পদোন্নতি পেত সুবেদার পর্যন্ত। তাছাড়া একজন ব্রিটিশ সৈন্য অবসর গ্রহণ করত ৭০ বছর বয়সে যেখানে একজন ভারতীয় অবসর পেত মাত্র ৫৫ বছর বয়সে। এছাড়া ১৮৫৬ সালে লর্ড ক্যানিং 'General Service Enlistment Act' নামক একটি আইন পাশ করে। এতে বলা হয় দেশীয় সিপাহীদের প্রয়োজনে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দূর দেশে গিয়ে কাজ করতে হবে। হিন্দু সিপাহীগণ সমুদ্র পাড়ি দেওয়াকে ধর্ম বিরুদ্ধ মনে করত। ফলে তাদেরকে 'কালাপানি' অর্থাৎ সমুদ্র পাড়ি দিতে বাধ্য করায় তাদের মধ্যে ভীষণ অসন্তোষ দেখা দেয়।
- **প্রত্যক্ষ কারণ/তাৎক্ষণিক কারণ :** কোম্পানি সামরিক বাহিনীতে 'Enfield Rifle' নামক এক প্রকার নতুন অস্ত্রের প্রচলন শুরু করে, যার কার্তুজ দাঁত দিয়ে কাটতে হত। গুজব রটে যে, এ কার্তুজে শুকর ও গরুর চর্বি মিশ্রিত আছে যা যথাক্রমে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ে ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ। এ ঘটনা সিপাহীদের বিদ্রোহী করে

তোলে এবং ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয় যা মূলত ইংরেজদের প্রতি একশ বছর ধরে জমে থাকা ক্ষোভের বহি:প্রকাশ।

বিদ্রোহের বিস্তার : ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ ব্যারাকপুর প্যারেড গ্রাউন্ডে এনফিল্ড রাইফেল ব্যবহার করতে বলা হলে সিপাহীদের মধ্য থেকে 'মঙ্গল পান্ডে' নামক একজন সিপাহী প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেন। ক্রমে এটি বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে এবং মিরাট, দিল্লী, বেরুলী, কানপুর, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, কলকাতা, বিহার, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীরা মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে ভারতের বাদশাহ ও বিদ্রোহের নেতা ঘোষণা করেন। মারাঠা নেতা নানা সাহেব, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মী বাই, মৌলভী লিয়াকত আলী প্রমুখ ব্যক্তিত্ব বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। ১৮৫৭ সালে প্রথমত সিপাহীরা এ বিদ্রোহ শুরু করলেও পরবর্তীতে সাধারণ মানুষও এতে অংশগ্রহণ করে। ইংরেজরা কঠোর হাতে এ বিদ্রোহ দমন করে। বিদ্রোহ এক বছরের কিছু বেশী সময় স্থায়ী ছিল।

ফলাফল ও মূল্যায়ন : সিপাহী বিদ্রোহের ফলাফল সুদূরপ্রসারী। এ বিদ্রোহ সফল না হলেও এটি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূলে প্রচন্ড আঘাত হানে। ১৮৫৮ সালে বিদ্রোহ শেষে এক ঘোষণা বলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেন এবং অবসান হয় একশ বছরের কোম্পানি শাসন। ব্রিটিশ রাজ 'স্বত্ব বিলোপ নীতি' বাতিল ঘোষণা করে। সামরিক বাহিনীতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। বাহাদুর শাহ জাফরকে রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠানো হয়। ভারতবর্ষের বিষয়াবলী দেখাশোনার জন্য 'ভাইসরয়' নামক একটি পদ সৃষ্টি করা হয়। এভাবে ইংরেজরা তাদের শাসনকার্যে ব্যাপক পরিবর্তন আনেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	সিপাহী বিদ্রোহকে ভারত উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন বলা হয় কেন?

সারসংক্ষেপ

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁদের একশ বছরের শাসনামলে এ দেশের মানুষকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিকসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে শোষণ ও অত্যাচার করে। কোম্পানির প্রতি জমে থাকা ক্ষোভ ও অসন্তোষের বহি:প্রকাশ ঘটে সিপাহীদের মাধ্যমে। তাই ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সফল না হলেও এর মাধ্যমে ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার আকাংখা সৃষ্টি হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সিপাহী বিদ্রোহ কত সালে সংঘটিত হয়?

(ক) ১৭৫৭ সালে (খ) ১৯৪৭ সালে
(গ) ১৮৫৭ সালে (ঘ) ১৯০৫ সালে

২। 'কালাপানি' কী?

(ক) মরুভূমি (খ) নদী
(গ) সমুদ্র (ঘ) পর্বত

পাঠ-১.৪ ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১ ও ১৮৯২

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনের বিভিন্ন ধারা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আইন সভা, গভর্ণর জেনারেল, নির্বাহী পরিষদ, পরোক্ষ নির্বাচন।

১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে একশ বছরের কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে। ব্রিটিশ রাজ এ অঞ্চলের শাসন ভার স্বহস্তে তুলে নেয়। এ সময় ভারতবর্ষে ধাপে ধাপে ব্রিটেনের অনুকরণে আইন সভার উদ্ভব হয় । বস্তুত ১৮৫৮ সালের পরবর্তী বিভিন্ন ভারত শাসন আইনের মধ্যেমেই এ দেশে শাসনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটে। এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের শাসনকার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট করা। ১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

১. গভর্ণর জেনারেলের নির্বাহী পরিষদ ৫ জন সাধারণ সদস্য নিয়ে গঠিত হয়।
২. আইন সভা গভর্ণর জেনারেলের নির্বাহী পরিষদের ৫ জন সাধারণ সদস্য ছাড়াও ন্যূনতম আরো ৬ জন এবং অনধিক ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। অতিরিক্ত সদস্যগণ গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক দুই বছরের জন্য মনোনীত হন এবং এই সদস্যদের অর্ধেক বেসরকারি সদস্য।
৩. গভর্ণর জেনারেল নির্বাহী ও আইন উভয় পরিষদের সভাপতি।
৪. আইনসভা কর্তৃক পাসকৃত যে কোন বিলে সম্মতি প্রদান, ভেটো প্রদান বা ব্রিটিশ রাণীর জন্য সংরক্ষিত রাখার অধিকার গভর্ণর জেনারেলকে প্রদান করা হয়।
৫. গভর্ণর জেনারেলের পূর্বানুমতি ছাড়া সরকারি ঋণ, সেনাবাহিনী, বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে কোন বিল আইন সভায় উত্থাপন করা যেত না।
৬. আইন সভার সদস্যগণ আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক উত্থাপিত কোন বিষয়ে অংশগ্রহণ ও পরামর্শ দান করতে পারত। তবে কোনরূপ প্রশ্ন করার অধিকার ছিল না।
৭. এ আইন দ্বারা বোম্বে ও মাদ্রাজের প্রাদেশিক আইন সভা পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ করা হয়।
৮. এ আইন দ্বারা বাংলা, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জন্য নতুন আইন সভার বিধান করা হয়।

মূল্যায়ন

১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। নির্বাহী পরিষদ ও আইন সভা উভয় ক্ষেত্রে সরকারি সদস্যদের প্রাধান্য ছিল। বেসরকারি সদস্যদের মধ্যে রাজ অনুগত ভারতীয়দের মনোনীত করা হয়। গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বহাল ছিল। এতদ্সত্ত্বেও এ আইন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর ফরে ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল আইন সভার ভিত্তি রচিত হয়।

১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন

১৮৬১ সালের তিন দশক পর ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন পাশ হয়। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অপরদিকে ব্রিটিশ শাসকগণ ১৮৬১ সালের আইনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এমতাবস্থায়, লর্ড ডাফরিনের চেষ্টায় ১৮৯২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ভারতীয় কাউন্সিল আইন প্রণীত হয়। এ আইনের প্রাধান বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

১. এ আইনে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। এতে কমপক্ষে ১০ জন এবং সর্বাধিক ১৬ জন অতিরিক্ত সদস্য রাখার বিধান করা হয়।
২. বিভিন্ন প্রদেশের আইন সভার সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়।
৩. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় আইন সভায় সরকারি সদস্যদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা ও প্রাধান্য অব্যাহত থাকে।
৪. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় আইন সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি এ আইনে সম্প্রসারিত হয়।
৫. আইন সভার সদস্যবৃন্দ বাজেট আলোচনা ও প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার অধিকার লাভ করে।
৬. আইন সভার বেসরকারি সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হওয়ার নীতি স্বীকৃত হয়।

মূল্যায়ন ঃ

১৮৯২ সালের আইনও ভারতীয়দের প্রত্যাশার তুলনায় অপ্রতুল ছিল। আইন সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি বৃদ্ধি করা হলেও তা ছিল সীমিত। এ আইনের উল্লেখযোগ্য দিক হলো পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির প্রচলন।

শিক্ষার্থীর কাজ	ভারতীয় কাউন্সিল আইন ১৮৬১ ও ১৮৯২ এর মূল পার্থক্য চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন শাসন কার্যে আরো অধিক পরিমাণে ভারতীয়দের অংশগ্রণের সুযোগ করে দেয়। এ সকল আইনের ধারাবহিকতায় ব্রিটিশ রাজ পরবর্তীতে আরো অনেক আইন প্রবর্তন করে যা ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক বিকাশ সাধিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। গভর্ণর জেনারেলের নির্বাহী পরিষদ কয়জন সাধারণ সদস্য নিয়ে গঠিত হত?
(ক) তিনজন (খ) চারজন
(গ) পাঁচজন (ঘ) ছয়জন

২। কাউন্সিল আইন অনুসারে শাসনকার্যের সর্বেসর্বা কে?
(ক) সরকারি সদস্য (খ) বেসরকারি সদস্য
(গ) রাজ অনুগত নাগরিক (ঘ) গর্ভণর জেনারেল

৩। ১৮৯২ সালের কাউন্সিল আইনকে বলা হয়
i. উগ্র জাতীয়তাবাদের পথ প্রদর্শক
ii. প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার প্রাথমিক ধাপ
iii. সংসদীয় সরকারের ভিত্তিস্বরূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৫ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ১৮৮৫

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পৃষ্ঠপোষকতা, ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রতিনিধি, নেতৃত্ব, আনুগত্য, স্বকীয়তা।

ভারতীয় কংগ্রেস হল ভারতীয়দের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও অচিরেই এ দলের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে এ দলের নেতৃত্বে ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে।

পটভূমি

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ছিল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণির জাতীয়তাবাদী চেতনার একটি সর্বভারতীয় প্রকাশ। ঔপনিবেশিক শাসনামলে এ অঞ্চলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটে। ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও দেশের বিভিন্ন জেলায় সরকারি স্কুল-কলেজ ও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবকাঠামো রচিত হয়। তাছাড়া ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সুনির্দিষ্ট দাবি-দাওয়া ভিত্তিক এসোসিয়েশন বা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। যেমন, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), কলকাতায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন (১৮৫১), সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন (১৮৭৬), বোম্বে এসোসিয়েশন (১৮৫২) ইত্যাদি।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে উপনিবেশিক ভারতে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের এক ধরণের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ সালে কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর উদ্যোগে দু'বার 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়। একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার তাগিদ থেকেই তিনি এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৮৫ সালে ২৮ ডিসেম্বর বোম্বে শহরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাঙালি আইনবিদ উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মোট ৭২ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ আই.সি.এস. অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। এ ব্যাপারে হিউম বড়লাট লর্ড ডাফরিনের সহযোগিতা পেয়েছিলেন। এ উদ্যোগের পেছনে ব্রিটিশ সরকারের পূর্ণ সমর্থন ছিল। ব্রিটিশরা লক্ষ্য করে যে, ভারতবর্ষে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় সময়ের ব্যাপার মাত্র। তখন সে প্রতিষ্ঠান ও তার নেতৃত্ব যাতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থাকে, তা নিশ্চিত করার প্রয়োজন অনুভব করে। তাই ব্রিটিশরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বলে কোন কোন বিশ্লেষক মনে করেন। অপরদিকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় ভারতীয়দের মধ্যে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে দাদাভাই নওরোজি, ফিরোজ শাহ মেহতা, এ টি তেলাঙ্গা, বদরুদ্দীন তৈয়বজি, সুব্রামানিয়াম আয়ার, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালীন নীতি-আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি আনুগত্য।
২. জাতি-ধর্ম-বর্ণ আঞ্চলিকতার সংকীর্ণতা দূর করে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা।
৩. সরকারি চাকরিতে ভারতীয়দের যথোপযুক্ত সংখ্যায় নিয়োগ।
৪. শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা।
৫. প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচন।

৬. আইন সভা পুনর্গঠন করে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ও ক্ষমতার সম্প্রসারণ।

মোট কথা, কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থেকে যতদূর সম্ভব উল্লেখিত স্বার্থসমূহ আদায়ের চেষ্টা করা।

কংগ্রেসের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালীন অধিবেশনে উপস্থিত ৭২ জন প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র ০২ জন ছিলেন মুসলমান। পরবর্তী অধিবেশনসমূহে মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও তা ছিল নগণ্য। ইংরেজী শিক্ষাকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য ছিল। শুরুতে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করায় হিন্দুরা মুসলমানদের থেকে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে অনেক এগিয়ে যায়। এ প্রেক্ষাপটে কংগ্রেসে কার্যত হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য ছিল। এ সকল নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা বা অন্য কোনো অধিবেশনে যোগদান করা থেকে নিজেদের বিরত রাখেন। হিন্দু প্রাধান্য রয়েছে এমন কোনো দলে যোগদান করলে স্বকীয়তা হারিয়ে যেতে পারে এ আশংকা তাদের মধ্যে সক্রিয় ছিল। এক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খানের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষণীয় ছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	'ভারতীয় কংগ্রেস ইংরেজদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত' এ কথার অর্থ কী?

সারসংক্ষেপ

ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্যোগে ব্রিটিশদের প্রতি অনুগত একটি নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন হিসেবে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। তবে কংগ্রেস পরবর্তীকালে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। অপরদিকে, কংগ্রেস একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু নানাবিধ কারণে সংগঠনটি ভারতের মুসলমানদের ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন কে?
(ক) অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম (খ) মহাত্মা গান্ধী (গ) জওহর লাল নেহেরু (ঘ) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

২। ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়–
i. ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর
ii. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়
iii. বোম্বাই শহরে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। ইংরেজ শাসনের প্রতি অবিচল আনুগত্যই হবে এ প্রতিষ্ঠানের মূলভিত্তি। এখানে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে?
(ক) ভারতীয় কংগ্রেস (খ) মুসলিম লীগ (গ) কৃষক প্রজা আন্দোলন (ঘ) মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন

পাঠ-১.৬ বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫ ও বঙ্গভঙ্গ রদ, ১৯১১

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বঙ্গভঙ্গের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বঙ্গভঙ্গের ফলাফল চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ বলতে পারবেন।
- বঙ্গভঙ্গ রদের ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	শাসন ব্যবস্থা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িক, অর্থনৈতিক, কেন্দ্রস্থল, রাজনৈতিক সংগঠন।

বাংলা ও ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ভারতের যে রাজনৈতিক আলোড়নের সৃষ্টি হয় তা পরবর্তীতে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

বঙ্গভঙ্গ

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত ছিল বাংলা প্রদেশ বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি। এটি ছিল ব্রিটিশ ভারতের বৃহত্তম প্রদেশ। ব্রিটিশ সরকার শাসনকাজে সুবিধার জন্য বাংলা প্রদেশকে বিভক্তিকরণের কথা চিন্তা করতে থাকে। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন স্যার বাম্পফিল্ড ফুলার এবং স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতে বড়লাট লর্ড কার্জন ও বাংলা বিভক্তিকরণের বিষয়ে আলোচনা করেন। অতপর ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন হয়। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও আসামকে নিয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়। এর রাজধানী হয় ঢাকা। নতুন প্রদেশের রাজধানী ছিল ১,০৬,৫০৪ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ১০ লক্ষ। এ প্রদেশে মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

বঙ্গভঙ্গের কারণ

ব্রিটিশ সরকার প্রধানত প্রশাসনিক কারণে বঙ্গভঙ্গ করলেও এর পেছনে আরো অনেক কারণ ছিল। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হল:

শাসনতান্ত্রিক কারণ

১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন অনুসারে সৃষ্ট বাংলা প্রদেশ ছিল ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় প্রদেশ। এই বিশাল আয়তনের শাসনভার একজন গভর্ণরের উপর ন্যস্ত ছিল। ফলে শাসনতান্ত্রিক শৃংখলা রক্ষা ছিল দুরূহ ব্যাপার। তাই বাংলা প্রদেশকে ভাগ করার জন্য ব্রিটিশরা চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। অবশেষে লর্ড কার্জন বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করে নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন।

রাজনৈতিক কারণ

বিশ শতকের প্রারম্ভে ভারতীয় জনসাধারণের মাঝে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে। এক্ষেত্রে বাংলা প্রদেশ ছিল অনেক অগ্রসর। বলা হত 'What Bengal thinks today, India thinks tomorrow' এ কারণে ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে ভাগ করে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ভাগ করতে চেয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল।

সামাজিক কারণ

ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে নানাবিধ কারণে মুসলমান সমাজ ধীরে ধীরে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে থাকে। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা ভেবেছিল বাংলাকে ভাগ করলে তারা তাদের হারানো গৌরব ফিরে পাবে।

অর্থনৈতিক কারণ

বাংলা প্রদেশের রাজধানী কলকাতা হওয়ায় সকল ব্যবসা বাণিজ্য ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। তাছাড়া কলকাতার হিন্দু সম্প্রদায় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দেয়। এই বাস্তবতা বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে উচ্চবর্গের অনেক মুসলমানকেও আকৃষ্ট করে।

ভাগ কর, শাসন কর নীতি

বঙ্গভঙ্গ করার প্রস্তাব ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে আসে। বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের দাবির ফসল ছিল না। পরবর্তীকালে এর ঘোর সমর্থক ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ স্বয়ং শুরুতে এ ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। কার্যত এটি ছিল ব্রিটিশদের 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতির ফল। মূলত হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে মুসলিম সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাকে ভাগ করা হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববাংলার জনগণের সার্বিক উন্নতি হবে এ আশাবাদ থেকে পূর্ববাংলায় নতুন প্রদেশের প্রতি সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় প্রধানত দুইটি কারণে বঙ্গভঙ্গের ঘোর বিরোধিতা করে। প্রথমত, বাংলার রাজনীতি, অর্থনীতি ব্যবসা-বাণিজ্য, ইত্যাদি সবকিছু কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। নতুন প্রদেশ গঠনের ফলে তাদের স্বার্থে চরম আঘাত লাগে। দ্বিতীয়ত, দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী হিন্দু নেতৃবৃন্দের নিকট বাংলা বিভক্তি ছিল 'মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ' এর মত। বঙ্গভঙ্গকে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ব্রিটিশ ষড়যন্ত্র বলে অ্যাখায়িত করে তাঁরা এর ঘোর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। এ সকল কারণে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দ্রুত বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে, স্বদেশীপণ্য ব্যবহার এবং বিদেশী পণ্য বর্জনের কর্মসূচি যুক্ত হয়। এক পর্যায়ে আন্দোলন সহিংস রূপ ধারণ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়ে। কুমিল্লা, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, জামালপুর, পাবনা, রাজশাহীসহ পূর্ব বাংলায় বহু স্থানে হিন্দু-মসুলমান সম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়। আন্দোলন তীব্র হলে ব্রিটিশ সরকার নত হতে বাধ্য হয়। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে, তিনি ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরের কথা বলেন।

বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদের ফলাফল

বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট নতুন প্রদেশে তাৎক্ষণিক কিছু উন্নয়ন কর্মকান্ড সাধিত হলেও বাঙালির অখন্ড চেতনার জন্য তা ছিল আত্মঘাতমূলক। হিন্দু সম্প্রদায়ের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সংগঠনের আবশ্যকতা তুলে ধরে।

বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন বাঙালির মধ্যে জাতিসত্তা বোধ জাগিয়ে তোলে। অপরদিকে বঙ্গভঙ্গ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ১৯১১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার জনগণের মাঝে একটি সাম্প্রদায়িক রেখা সৃষ্টি করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বঙ্গভঙ্গ কী সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি করেছিল?

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ শাসকরা বাংলা বিভাগকে স্থায়ী ব্যবস্থা বলেছিল, যদিও নতুন প্রদেশ সৃষ্টির ৬ বছরের মধ্যে তা বাতিল ঘোষিত হয়। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান ঘটে। বঙ্গভঙ্গ কেন্দ্রিক রাজনীতিতে ব্রিটিশদের অনুসৃত 'ভাগ কর ও শাসন কর নীতি' প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বঙ্গভঙ্গ সংগঠিত হয় কত সালে?

(ক) ১৯০৩ সালে (খ) ১৯০৫ সালে

(গ) ১৯০৬ সালে (ঘ) ১৯১১ সালে

২। বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণার মূল কারণ কোনটি?

(ক) বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন (খ) মুসলমানদের দুর্বল রাজনীতি

(গ) ব্রিটিশ স্বার্থ (ঘ) হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপন

৩। বঙ্গভঙ্গের মূল্যায়ন হিসেবে যৌক্তিক হলো–

i. হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উন্নতি

ii. ব্রিটিশদের 'ভাগ কর ও শাসন কর-' নীতির বিজয়

iii. মুসলিম লীগের জন্ম

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৭ মুসলিম লীগ, ১৯০৬

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করতে পারবেন;
- মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এর বিকাশ ধারা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাজনৈতিক সংগঠন, আলিগড় আন্দোলন, প্রতিনিধিত্ব স্বতন্ত্র, পৃথক নির্বাচন

মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক দল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ২১ বছর পর মুসলমানরা নিজেদের জন্য একটি রাজনৈতিক সংগঠন তৈরী করে। পরবর্তীতে এ রাজনৈতিক দলের দাবি অনুযায়ী ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হয়।

পটভূমি

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলিগড় আন্দোলনের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি মুসলমানদের এতে যোগদান করা থেকে বিরত থাকতে বলেন। কারণ তিনি আশংকা করেছিলেন সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায় সরাসরি রাজনীতিতে যুক্ত হলে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলবে। তিনি মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেন।

মুসলিম লীগ

তিনি মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরের বছর তিনি 'অল ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' বা শিক্ষা সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করেন। আলীগড়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় তাঁর শিক্ষা আন্দোলন যা 'আলীগড় আন্দোলন' নামে পরিচিত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমানরা এখানে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলীগড় আন্দোলনের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গ ও এর রদ আন্দোলন অন্যতম কারণ ছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন শুরু হয়। বাংলায় বঙ্গভঙ্গের প্রধান সমর্থক ছিলেন নবাব সলিমুল্লাহ। এ সময় তিনি ভারতবর্ষে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করেন।

অপরদিকে, ১৮৯২ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনে তা সম্প্রসারিত করা হয়। তবে এসব সংস্থার প্রতিনিধি নির্বাচনে অনগ্রসর ও অসংগঠিত মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল। ১৯০৬ সালের ২০শে জুলাই জন মর্লি ব্রিটিশ ভারতের শাসনকার্যে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব আরো বৃদ্ধির ঘোষণা দেন। এ ঘোষণা ভারতীয় মুসলমানদের চিন্তিত করে তোলে। ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ভারতের শীর্ষস্থানীয় ৩৫ জন মুসলমানের একটি প্রতিনিধি দল সিমলায় লর্ড মিন্টোর কাছে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবী জানান। লর্ড মিন্টো মুসলমানদের তাঁদের দাবি বিবেচনার আশ্বাস দেন।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রতিষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের ২০তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ঢাকায় মিলিত হন। এর আগে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ মুসলমানদের জন্য একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে নেতৃস্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের নিকট

প্রচারপত্র প্রেরণ করেন। ৩ দিনব্যাপী শিক্ষা সম্মেলন শেষে চতুর্থ দিনে অর্থাৎ ৩০ শে ডিসেম্বর মুসলিম নেতৃবৃন্দ একটি রাজনৈতিক অধিবেশনে মিলিত হন। ভারতের বিভিন্ন অংশের মোট ৬৮জন প্রতিনিধি এ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। নবাব সলিমুল্লাহ মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠনের মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অপর এক প্রস্তাবে নবাব ভিকার-উল-মুলক ও নবাব মোহসীন-উল-মুলক এ দু'জনকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৬০ সদস্য বিশিষ্ট অন্তবর্তীকালীন কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিকে গঠনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। এভাবেই 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' নামক একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়।

১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠাকালে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে গৃহীত হয়-

১. ভারতের মুসলমানদের মধ্যে মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের মনোভাব সৃষ্টি করা।
২. ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে কোন প্রকার ভুল ধারণার জন্ম হলে তা দূর করা।
৩. ভারতীয় মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং তাদের প্রয়োজন ও প্রত্যাশার কথা বিবেচনা ও আনুগত্যের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের নিকট পেশ করা।
৪. মুসলিম লীগের অন্যান্য উদ্দেশ্য যেন বিঘ্নিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা।

মুসলিম লীগের বিকাশধারা

১৯০৬ সালে মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠার পর ১৯০৮ সালে আলীগড়ে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে আগা খানকে সভাপতি ও সৈয়দ হাসান বিলগ্রামিকে সাধারণ সম্পাদক করে ৪৩ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। ১৯১৩ সাল পর্যন্ত আগা খান লীগের স্থায়ী সভাপতি ছিলেন তবে মতপার্থক্যের কারণে তিনি ঐ একই বছর সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। বস্তুত এ সময় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবসম্পন্ন, শিক্ষিত, স্বাধীন পেশায় যুক্ত, বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ একটি অংশ মুসলিম লীগের নেতৃত্বে আসেন। এদের মধ্যে ফজলুল হক, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, সৈয়দ ওয়াজির হাসান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এদের নেতৃত্বে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌ চুক্তি। কংগ্রেস ও লীগ মিলিতভাবে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করে। তবে মুসলিম লীগের সাংগঠনিক বিস্তৃতি ঘটেনি। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনের পূর্বে জিন্নাহ মুসলিম লীগকে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ৪৮২টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১০৪টি আসন লাভ করে। এ নির্বাচনের পর থেকে মুসলিম লীগের সাংগঠনিক বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পর মুসলিম লীগ অতি দ্রুত গণভিত্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার কারণ কী?

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশদের প্রতি অনুগত বিত্তবান এবং শিক্ষিত রক্ষণশীল মুসলমানদের নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠার পরবর্তী তিন দশক পর্যন্ত মুসলীম লীগ কার্যত কোন সাংগঠনিক ভিত্তি সম্পন্ন রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হতে পারেনি। পরবর্তীতে লাহোর প্রস্তাব মুসলিম লীগের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

(ক) ১৯০৫ সালে (খ) ১৯০৬ সালে

(গ) ১৯১১ সালে (ঘ) ১৯০৯ সালে

২। ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের আলাদা সংগঠনের উৎসাহ দেন কেন?

(ক) কংগ্রেসের প্রতি আস্থাশীলতার জন্য

(খ) কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ মনোভাবের জন্য

(গ) মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ধ্বংস করার জন্য

(ঘ) হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে উৎসাহ দেয়ার জন্য

৩। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল

i. সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা

ii. ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য নিশ্চিত করা

iii. মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া উত্থাপন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৮ মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন, ১৯০৯

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইনের মূল্য বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সদস্য বৃদ্ধি, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, স্বরাজ, রাজনৈতিক চেতনা।

পটভূমি

ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পূর্ববর্তী আইনসমূহ ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ক্রমাগত ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব বিধানের দাবি উত্থাপন করতে থাকে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। অন্যদিকে, ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ও রাজনৈতিকভাবে নিজেদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'। এমনই এক পটভূমিতে ব্রিটিশ সরকারের ভারত সচিব লর্ড মর্লি এবং ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর উদ্যোগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো আইন পাশ হয়।

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো আইন এর মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

১. এ আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর নির্বাহী পরিষদের ৭ জন সদস্য ছাড়াও সর্বাধিক ৬০ জন অতিরিক্ত সদস্য এতে অন্তর্ভুক্ত হন।

২. প্রাদেশিক আইনসভাসমূহেরও সম্প্রসারণ করা হয়। বড় প্রদেশের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ৫০ জন এবং ছোট প্রদেশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩০ জন সদস্য থাকার বিধান করা হয়।

৩. এ আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় আইনসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। সদস্যরা বাজেট বা অর্থ বিল নিয়ে আলোচনা করার অধিকার লাভ করে।

৪. এ আইনে মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবী অনুযায়ী তাদের জন্য 'পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা' প্রবর্তন করা হয়।

৫. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলোতে নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতীয় বেসরকারি সদস্যগণ নির্বাচনের বিধান করা হয়। তবে অধিকাংশ সদস্যই নির্বাচিত হতেন পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে।

৬. এই প্রথমবার প্রাদেশিক আইনসভাসমূহে সরকারি সদস্যদের স্থলে বেসরকারি সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করা হয়।

৭. এ আইনের মাধ্যমে প্রথমবারের মত গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরের নির্বাহী পরিষদে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্ত করার বিধান করা হয়।

মূল্যায়ন

১৯০৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন পূর্ববর্তী সংস্কার আইনের তুলনায় অগ্রবর্তী পদক্ষেপ ছিল। যেমন- কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের সম্প্রসারণ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রাদেশিক আইনসভার বেসরকারি সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন, গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরের নির্বাহী পরিষদে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি। তবে ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান স্বরাজ বা স্বশাসনের দাবি পূরণে তা ব্যর্থ হয়। এ আইনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার স্বীকৃতি যা ভারতীয় রাজনীতিতে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইনের ৩টি গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। কোনো নীতিগত পরিবর্তন না করে প্রতিষ্ঠিত নীতির আওতাধীন থেকে ভারতবর্ষের নানা সম্প্রদায়ের আশা-আকাংখা পূরণ করাই ছিল এ আইনের লক্ষ্য। পূর্ববর্তী সংস্কার আইনের তুলনায় অগ্রবর্তী পদক্ষেপ হলেও তা ছিল ভারতীয়দের প্রত্যাশার তুলনায় অপ্রতুল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন কত সালে পাস হয়?

(ক) ১৮৮৫ সালে (খ) ১৯০৯ সালে

(গ) ১৯১৯ সালে (ঘ) ১৯৩৫ সালে

২। ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দানের প্রতি ব্রিটিশদের উদ্দীপ্ত করেছিল কোনটি?

(ক) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি (খ) মুসলিম লীগের রাজনীতি

(গ) ব্রিটিশদের উদারতা (ঘ) প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতবাসীর সহযোগিতা

৩। মলি-মিন্টো সংস্কার আইন ব্যর্থ হওয়ার কারণ–

i. ভারতীয় রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধি

ii. ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

iii. দায়িত্বশীল সরকারের প্রতি ভারতীয়দের আগ্রহ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৯ লক্ষ্ণৌ চুক্তি, ১৯১৬

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- লক্ষ্ণৌ চুক্তির পটভূমি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- লক্ষ্ণৌ চুক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সাম্প্রদায়িক ঐক্য, সমঝোতা, বিল পাশ, প্রতিনিধি, আসন বরাদ্দ, স্বায়ত্তশাসন

১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ভারতের ভবিষ্যত শাসনতান্ত্রিক রূপরেখা সম্পর্কে সম্পাদিত চুক্তিই লক্ষ্ণৌচুক্তি। ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেয়া হলেও মুসলিম নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারের উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থাশীল হতে পারেনি। ১৯১১ সালে একতরফাভাবে বঙ্গভঙ্গ রদ ব্রিটিশ রাজের প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়ের নি:শর্ত আনুগত্য বিনষ্ট করে। এরপর ১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধে তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধচারণ ভারতীয় মুসলমানদের মর্মাহত করে। ১৯১৩ সালে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পরিবর্তন আসে। নতুন নেতৃবৃন্দ সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনেন। তারা ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐক্যের উপর জোর দেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ রকম পরিস্থিতিতে, ১৯১৫ সালে বোম্বেতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রায় একই সময়ে নিজ নিজ দলের অধিবেশন আহবান করে। এ সময় উভয় দল ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন নীতি ও শাসন প্রক্রিয়ার সমালোচনা এবং সাম্রপ্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতির উপর গুরুত্বারোপ করে। ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ভারতের ভবিষ্যত শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক বিষয়ে সমঝোতায় আসে। এই সমঝোতার উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদিত হয়।

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

নিম্নে লক্ষ্ণৌ চুক্তির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হল-

১. প্রাদেশিক আইন পরিষদ সমূহ সম্প্রসারণ করার সুপারিশ করা হয়। বৃহৎ প্রদেশের সদস্য সংখ্যা ১২৫ জন এবং ছোট প্রদেশের সদস্য সংখ্যা ৫০ থেকে ৭৫ এর মধ্যে নির্ধারণ করার দাবি করা হয়। এদের মধ্যে পাঁচ ভাগের এক ভাগ মনোনীত সদস্য এবং বাকী পাঁচ ভাগের চার ভাগ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার দাবি করা হয়।

২. কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক আইন পরিষদে কোন সম্প্রদায়ের কোনো বিল পাশের ক্ষেত্রে আইনসভায় ঐ সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতির বিধান রাখা হয়।

৩. লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভোটারদের ভোট দিতে উৎসাহিত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

৪. এ চুক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এতে সংখ্যানুপাতে অধিক প্রতিনিধিত্বের সুপারিশ করা হয়। অর্থাৎ যেখানে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু, সেখানে তাদের আসন সংখ্যা লোকসংখ্যা থেকে বাড়িয়ে দেয়া হবে। আর যেখানে সংখ্যাগুরু সেখানে জনসংখ্যার তুলনায় তারা কম আসন লাভ করবে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় বাংলা প্রদেশের কথা। বাংলার মুসলিম জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫২.৬ শতাংশ আর মুসলিম আসন বরাদ্দ করা হয় ৪০ শতাংশ। এভাবে বিহার ও উড়িষ্যাতে ২৫ শতাংশ, সেন্ট্রাল প্রদেশে ১৫ শতাংশ, মাদ্রাজে ১৫ শতাংশ, পাঞ্জাবে ৫০ শতাংশ এবং যুক্ত প্রদেশে ৩০ শতাংশ আসন বরাদ্দের কথা বলা হয়।

৫. এ চুক্তিতে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার স্বীকৃতির পাশাপাশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন প্রদানে সম্মতি দেয়া হয়।

৬. ভারতের জন্য স্ব-শাসন কায়েমের লক্ষ্যে কংগ্রেসও মুসলিম লীগ একত্রে আন্দোলন করবে।

৭. প্রদেশসমূহ কেন্দ্রীয় সরকার যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে স্বায়ত্বশাসন ভোগ করবে।

৮. গভর্ণর জেনারেলের শাসন পরিষদের অর্ধেক সদস্য ভারতীয় হবেন। তারা ভারতীয় আইন পরিষদের সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

গুরুত্ব

ভারতীয় উপমহাদেশের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে **১৯১৬** সালের লক্ষ্নৌ চুক্তি এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ চুক্তির মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে নিজেদের দাবি-দাওয়া পেশ করার সুযোগ পায়। প্রথমবারের মতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তি রচনা করে এই চুক্তি। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে সংগঠিত ও পরিকল্পিত করার জন্য এ চুক্তি করা হয়। লক্ষ্নৌ চুক্তির মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার স্বীকৃতি দেয়া হয়। তা সত্ত্বেও বাংলার রক্ষণশীল মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এর মূলে ছিল আসন সংখ্যা সমন্বয়ের নীতি।

শিক্ষার্থীর কাজ	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় লক্ষ্নৌ চুক্তির গুরুত্ব লিখুন।

সারসংক্ষেপ

লক্ষ্নৌ চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য জোরদার করা। ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে লক্ষ্নৌ চুক্তি এক গরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ এ চুক্তি ভারতে এক অভূতপূর্ব সাংবিধানিক অগ্রগতির পটভূমি রচনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোন স্থানে **১৯১৫** সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সম্মেলন আহবান করে?

(ক) লক্ষ্নৌতে (খ) বোম্বেতে

(গ) করাচিতে (ঘ) লাহোরে

২। লক্ষ্নৌ চুক্তির প্রাক্কালে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কিসের উপর গুরুত্ব দেন?

(ক) হিন্দু ধর্ম (খ) মুসলিম স্বার্থ

(গ) ব্রিটিশ স্বার্থ (ঘ) হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি

পাঠ-১.১০ মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন, ১৯১৯

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইন প্রবর্তিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংস্কার, রাজন্য সভা, ব্যবস্থাপক সভা, সংরক্ষিত, হস্তান্তরিত, হাইকমিশনার।

১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন ভারতীয়দের আশা আকাংখা পূরণে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে ১৯০৫ থেকে ১৯১১ এই সময়ের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ ও পরবর্তীতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সাফল্য ভারতবাসীর মধ্যে স্বশাসনের দাবি প্রবল করে তোলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবাসীর সহযোগিতার পুরস্কারস্বরূপ এবং যুদ্ধ শেষে ভারতের জন্য নতুন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার অবধারিত ছিল বিধায় ভারত সচিব মন্টেগু ১৯১৭ সালের ২০ আগস্ট কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, ভারতীয়দের ভারত শাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ দিয়ে পর্যায়ক্রমে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা ব্রিটিশ সরকারের নীতি। এর ভিত্তিতে ভারত সচিব মন্টেগু এবং ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল চেমসফোর্ড এ দু'য়ের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইন পাশ করা হয়।

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

১৯১৯ সালের মেন্টগু-চেমসফোর্ড আইনের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হল :

১. ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আইনসভায় পরিবর্তন করা হয়। উচ্চকক্ষের নাম হয় রাজন্য সভা এবং নিম্নকক্ষের নাম হয় ব্যবস্থাপক সভা । উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা ৬০ জন নির্ধারণ করা হয় এবং তন্মধ্যে ৩৪ জন নির্বাচিত এবং অবশিষ্ট ২৬ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যা ১৪৫ জন নির্ধারণ করা হয় তন্মধ্যে ১০৫ জন থাকবেন নির্বাচিত এবং অবশিষ্ট ৪০ জন সরকার মনোনীত হন।

২. এ আইনের মাধ্যমে সকল প্রদেশের জন্য একটি করে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিধান করা হয়। প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। তাছাড়া এ আইনে উল্লেখ করা হয় যে, প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে শতকরা ৭০ ভাগ নির্বাচিত এবং বাকী সদস্যরা মনোনীত হবেন।

৩. প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তনের লক্ষ্যে এ আইনে সরকারের কার্যাবলিকে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, মুদ্রা, ব্যাংক, বাণিজ্য, আয়কর, শুল্ক, ডাক, রেলওয়ে, তার, যোগাযোগ প্রভৃতি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রাখা হয়। অপরদিকে আইন শৃঙ্খলা, শিক্ষা, ভূমি, রাজস্ব, কৃষি, সেচ, পূর্ত, গণস্বাস্থ্য প্রভৃতি প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

৪. ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল প্রদেশে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় প্রবর্তন। এ ব্যবস্থার প্রাদেশিক বিষয়সমূহকে 'সংরক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত' এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। আইন-শৃঙ্খলা, ভূমি, রাজস্ব, সেচ। বিচার, জেল প্রভৃতি 'সংরক্ষিত' বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল। অপরদিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, স্থানীয় সরকার, পূর্ত প্রভৃতি। হস্তান্তরিত বিষয় ছিল, গভর্ণর এবং তার নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ 'সংরক্ষিত' বিষয়ের দায়িত্বে ছিলেন। আর 'হস্তান্তরিত' বিষয়সমূহ গভর্ণর ও তাঁর মন্ত্রীদের দায়িত্বে ছিল। মন্ত্রীগণ আইনসভার সদস্যদের মধ্য থেকে গভর্ণর কর্তৃক নিযুক্ত হতেন।

৫. এ আইনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি পাঞ্জাবের শিখ, এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, ভারতীয় খ্রিষ্টান এবং ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

৬. নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রবর্তন এ আইনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। এ আইনের মাধ্যমে বেসরকারি সদস্যদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ভোটার হওয়ার যোগ্যতার মধ্যে ছিল শিক্ষা, সম্পত্তির মালিকানা, পৌরকর প্রদান ইত্যাদি। স্বাভাবিক কারণে ভোটারের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত।
৭. এ আইনের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডে ভারতীয়দের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য হাইকমিশনারের একটি পদ সৃষ্টি করা হয়।

মূল্যায়ন

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশে দ্বৈতশাসনের মাধ্যমে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এ ব্যবস্থার ফলে প্রদেশগুলোতে শাসনক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া সংসদীয় পদ্ধতির দায়িত্বশীল ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আরো কিছু বিষয় যেমন- মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্বশীলতা, দায়বদ্ধতা ইত্যাদি আবশ্যক। কিন্তু এ সমস্ত বিষয় এ আইনে ছিল অনুপস্থিত। তথাপি, ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল ব্যবস্থা প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে **১৯১৯** সালের ভারত শাসন আইন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর পদক্ষেপ।

শিক্ষার্থীর কাজ	**১৯১৯** সালের ভারত শাসন আইন প্রয়োজন ছিল কেন?

সারসংক্ষেপ

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে ভারতীয়রা সীমিত আকারে হলেও দায়িত্বশীল সরকার পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট হবার সুযোগ পায়। আইনের ফলে আইনসভায় দুটি কক্ষের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক কক্ষেই নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও জোরদার হয়। বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাও বহাল ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। **১৯১৯** সালে প্রবর্তিত নতুন শাসন ব্যবস্থা ছিল–
(ক) প্রধানমন্ত্রীর শাসন (খ) দ্বৈতশাসন
(গ) গভর্নরের শাসন (ঘ) রাষ্ট্রপতির শাসন

২। **১৯১৯** সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা আইনসভায় যে চিত্র ফুটে ওঠে তাহলো–
i. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভা
ii. এক কক্ষবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভা
iii. প্রাদেশিক আইনসমূহের ৭০ ভাগ সদস্য ছিল নির্বাচিত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.১১ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তার ও পরিণতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	তুর্কি সাম্রাজ্য, খলিকা, জালিয়ানওয়ালাবাগ, খিলাফত সম্মেলন, পঞ্চায়েত।

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রথমবারের মত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়।

খিলাফত আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্ক ব্রিটেনের বিপক্ষে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে ব্রিটেন জয়লাভ করে। এর ফলে তুর্কি সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা হুমকির সম্মুখীন হয়। ভারতীয় মুসলমানরা তুরস্কের সুলতানকে মুসলমানদের খলিফা বা নেতা বলে মনে করত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ভারতীয় মুসলমানরা একটি শর্তে ব্রিটিশদের যুদ্ধে সহায়তা করেছিল আর তা হল ব্রিটিশরা তুর্কি সাম্রাজ্যের উপর হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু জয়লাভের পর ব্রিটিশরা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তুরস্ককে খণ্ড-বিখণ্ড করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায়, ভারতীয় মুসলমানরা তুর্কি সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও তুর্কি সুলতানের মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য ১৯১৯ সালে যে আন্দোলন গড়ে তোলে, তাই ইতিহাসে খিলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত।

অসহযোগ আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বজুড়ে যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয় তার সূত্র ধরে ভারতীয়রা ইংরেজদের কাছে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন এ প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে এ সময় ব্রিটিশ সরকার 'রাউলাট আইন' পাশ করে। এ আইনে শান্তি-শৃংখলা বিরোধী কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে কাউকে বিনা বিচারে দীর্ঘ সময়ের জন্য আটক করে রাখার বিধান করা হয়। এ আইনের ব্যাপারে জনমনে যখন অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছিল তখন আরেকটি ঘটনা ঘটে। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক স্থানে চতুর্দিকে প্রাচীর ঘেরা একটি মাঠে কয়েক হাজার মানুষ প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়। ব্রিটিশ সরকার এই নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালায় এবং এতে প্রায় চারশ মানুষ নিহত ও অনেকে আহত হয়। এমতাবস্থায়, ১৯১৯ সালে ব্রিটিশদের দমন ও পীড়নমূলক কার্যকলাপের প্রতিবাদে মহাত্মাগান্ধীর আহবানে সমগ্র ভারতব্যাপী যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তা অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত। এ আন্দোলনের প্রকৃতি ছিল অহিংস। একই সময়, ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন গড়ে ওঠে।

আন্দোলনের কর্মসূচি ও বিস্তার

খিলাফত আন্দোলনে ভারতীয় মুসলমানরা স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ভারতের বিভিন্নস্থানে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক খিলাফত কমিটি গঠিত হয়। কলকাতায় ১৯১৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি খিলাফতের সমর্থনে প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লিতে ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। খিলাফত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন মোহম্মদ আলী, শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, এ. কে. ফজলুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আয়োজিত 'শান্তি উৎসব' এর বিরোধিতা করে দিল্লি সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অপরদিকে অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে গান্ধী তাঁর 'বয়কট কর্মসূচী' প্রস্তাব করেন। এ কর্মসূচি ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও খিলাফত কমিটির সম্মেলনে অনুমোদিত হয়। বয়কট কর্মসূচি একই বছরের নভেম্বর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত যৌথ সম্মেলনে গৃহীত হয়। এ কর্মসূচিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়-

১. বিদেশী পণ্য বর্জন।
২. ব্রিটিশ প্রদত্ত খেতাব ও পদবি বর্জন এবং অবৈতনিক পদসমূহ ত্যাগ।
৩. ব্রিটিশ মনোনীত ভারতীয় সদস্যদের আইনসভা থেকে পদত্যাগ, কাউন্সিল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা।
৪. সরকারি স্কুল-কলেজ বর্জন এবং আইনজীবীদের আদালত বর্জন
৫. পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও সুসংহত করা
৬. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা
৭. সকল প্রকার সরকারি কার্যক্রম বর্জন করা।

খিলাফত আন্দোলন কর্তৃক বয়কট কর্মসূচি গ্রহণ এবং মাহাত্মা গান্ধীর খিলাফত আন্দোলনের প্রতি সমর্থন এ আন্দোলনকে তীব্র করে তোলে। মাহাত্মা গান্ধীর বয়কট কর্মসূচি জনগণকে প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত করে। জনগণ বিদেশী পণ্য বর্জনের পাশাপাশি ব্রিটিশ প্রদত্ত খেতাব ও পদবি বর্জন করতে থাকে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে এ আন্দোলনে সামিল হন এবং এক দুর্বার গণ আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলন দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন দমন ও নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের পরিণতি

আন্দোলন যখন তুমুল পর্যায়ে, তখন বিভিন্ন সহিংস ঘটনা ঘটতে শুরু করে। কিন্তু অহিংস আন্দোলনের আদর্শ সহিংসতা বিরোধী। এক পর্যায়ে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা নামক স্থানে উত্তেজিত জনতা স্থানীয় থানা আক্রমণ করে এবং এতে প্রায় ২২ জন পুলিশ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। এ ঘটনায় মর্মাহত হয়ে মাহাত্মা গান্ধী প্রায় একক সিদ্ধান্তে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। সাথে সাথে খিলাফত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। এর মূল কারণ ছিল এ রকম একটি গণআন্দোলন পরিচালনা করার মত সাংগঠনিক ক্ষমতা ও যোগ্যতা খিলাফলত নেতৃবৃন্দের ছিল না। ভারতে, ১৯২৪ সালে মোস্তফা কামাল পাশা তুরস্কের দায়িত্বভার গ্রহণ করে খিলাফতের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। ফলশ্রুতিতে খিলাফত আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	অসহযোগ আন্দোলন হঠাৎ করে প্রত্যাহার করা হল কেন?

সারসংক্ষেপ

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হলেও এ আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় জনগণ গণআন্দোলনের সাথে পরিচিত হয় এবং তা রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে সহায়তা করে। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। খিলাফত আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন–
i. মাওলানা মোহাম্মদ আলী

ii. মওলানা আব্দুল কালাম আজাদ
iii. মওলানা হামিদ খান ভাসানী
নিচের কোনটি সঠিক

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন–
i. হিংসাত্মক পথ বর্জনের মাধ্যমে
ii. হিংসাত্মক পথের মাধ্যমে
iii. সত্যাগ্রহ নীতিকে সামনে রেখে
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.১২ বেঙ্গল প্যাক্ট, ১৯২৩

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বেঙ্গল প্যাক্ট এর পটভূমি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন ।
- বেঙ্গল প্যাক্টের পরিণতি তথা ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সংখ্যাগরিষ্ঠ, সংখ্যানুপাত, ধর্মীয় অনুভূতি, ইতিবাচক, অস্বীকৃতি, অকার্যকর।

ব্রিটিশ বিরোধী অহিংস খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সহিংস রূপ ধারণ করলে, মহাত্মা গান্ধী ১৯২২ সালে এ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। আন্দোলন তুঙ্গে থাকা অবস্থায় তা বন্ধ ঘোষণা করার পর পক্ষে-বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত হতে থাকে। অপরদিকে, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক আইনসভার দ্বিতীয় নির্বাচন ১৯২৩ সালের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হবার কথা। এমতাবস্থায়, ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে এ সম্মেলনে মতভেদ দেখা দেয়। গান্ধীর নেতৃত্বাধীন একটি অংশ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বিপক্ষে ছিলেন না অপরদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (সি আর দাশ) এর নেতৃত্বাধীন আরেকটি অংশ নির্বাচনের পক্ষে ছিলেন। সি আর দাশের প্রস্তাব কংগ্রেস সম্মেলনে গৃহীত হয়নি এমতাবস্থায়, তিনি তাঁর সমর্থকদের নিয়ে ১৯২২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর গঠন করেন স্বরাজ পার্টি।

সি.আর দাশ ছিলেন সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পক্ষের মানুষ। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তিনি ব্রিটিশদের সহযোগিতা করতে চাননি বরং নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্রিটিশদের বিরোধিতা করতে চেয়েছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজ প্রদেশ বাংলায় মুসলমান নেতৃবৃন্দের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্যে ১৯২৩ সনে এক চুক্তি সাক্ষর করেন যা বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

বেঙ্গল প্যাক্টের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. বাংলায় প্রাদেশিক কাউন্সিল নির্বাচনে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব করবে।

২. স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় পাবে শতকরা ৬০ ভাগ আসন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পাবে শতকরা ৪০ ভাগ আসন।

৩. মুসলমান সম্প্রদায়ের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার স্বীকৃতি।

৪. সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা ৪৫ ভাগ বরাদ্দ করা হয়। যতদিন পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের চাকরি লাভের একই অনুপাত অর্জিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য ৮০ ভাগ চাকরি লাভের বিধান রাখা হয়।

৫. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এমন কোন কাজ করবে না যা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে।

প্যাক্টের পরিণতি

মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া

বেঙ্গল প্যাক্টের প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই ইতিবাচক। এ প্যাক্টের মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায় তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে দেখে সর্বাত্মকরণে চুক্তিকে স্বাগত জানায়। এ প্যাক্টের মাধ্যমে মুসলমানরা বাংলায় সংখ্যানুপাতে

প্রাদেশিক কাউন্সিল ও স্থানীয় পরিষদে আসন পায়। তাছাড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা এ প্যাক্টে স্বীকৃত হয়। তাই এ প্যাক্টের প্রতি মুসলমানদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হতে থাকে।

হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া

বেঙ্গল প্যাক্টের প্রতি বাংলা ও বাংলার বাইরের হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় একটি অংশের ছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। হিন্দু সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রাধীন পত্রিকাসমূহ বেঙ্গল প্যাক্টের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। সি আর দাশকে সুবিধাবাদী ও মুসলিম স্বার্থ রক্ষাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মহাত্মা গান্ধী বেঙ্গল প্যাক্টের কয়েকটি অংশের সমালোচনা করেন। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে কংগ্রেস বেঙ্গল প্যাক্ট অনুমোদন করতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ হিসেবে বলা হয়, হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানে প্রাদেশিক পর্যায়ের প্রচেষ্টা সর্বভারতীয় পর্যায়ের প্রচেষ্টাকে বিঘ্নিত করতে পারে।

বেঙ্গল প্যাক্টের প্রতি কংগ্রেসের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্যাক্টের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলে। ১৯২৫ সালে সি আর দাসের অকস্মাৎ মৃত্যু প্যাক্টের ভবিষ্যত অনিশ্চিত করে তোলে। তাঁর অনুপস্থিতিতে এ প্যাক্টের সমর্থনে কাজ করার মতো কোন জনপ্রিয় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোন নেতা ছিলেন না। এভাবে সি আর দাশের মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে বেঙ্গল প্যাক্ট অকার্যকর হয়ে পড়ে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বেঙ্গল প্যাক্ট দীর্ঘস্থায়ী হয় নি কেন?

সারসংক্ষেপ

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক সমঝোতার ক্ষেত্রে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ ছিল। অনগ্রসর মুসলিম জনগণের উন্নয়নে বেঙ্গল প্যাক্ট নি:সন্দেহে কার্যকর ছিল। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় একটি অংশের বিরোধীতা ও সি আর দাশের হঠাৎ মৃত্যুতে বেঙ্গল প্যাক্ট মুখ থুবড়ে পড়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

'ক' অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। নানা অজুহাতে এ অঞ্চলে বসবাসকারী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মারামারি ও হানাহানি লেগে থাকে। এ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য উভয় সম্প্রদায়ের কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তি একটি চুক্তি সম্পাদন করে।

১। উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলে কোন চুক্তির আভাষ পাওয়া যায়?

(ক) লক্ষ্ণৌ চুক্তি (খ) বেঙ্গল প্যাক্ট

(গ) পুনা চুক্তি (ঘ) সিমলা চুক্তি

২। এই চুক্তির উল্লেখযোগ্য দিক-

i. স্বায়ত্তশাসনের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা

ii. ধর্মভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা

iii. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.১৩ ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিধিবদ্ধ কমিশন, সাংবিধানিক অগ্রগতি, সাইমন কমিশন, নেহেরু রিপোর্ট, সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, যুগ্ম বিষয়, নতুন প্রদেশ।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ভারতীয়দের রাজনৈতিক আশা-আকাংখা পূরণে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১০ বছর পর ভারতের সাংবিধানিক অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য একটি বিধিবদ্ধ কমিশন গঠনের কথা ছিল। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ সরকার ১৯২৭ সালে স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করে। যা সাইমন কমিশন নামে পরিচিত। এ কমিশনে ভারতীয় কোন সদস্য অন্তর্ভুক্ত না থাকায় ভারতবর্ষের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ তথা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তা প্রত্যাখ্যান করে।

অপরদিকে, ভারতীয়দের জন্য সাংবিধানিক রূপরেখা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯২৮ সালে কংগ্রেস নিজেই মতিলাল নেহেরুকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি যে রিপোর্ট প্রকাশ করে, তা 'নেহেরু রিপোর্ট' নামে পরিচিত। এ রিপোর্টে মুসলমানদের দাবী-দাওয়া পূরণ না হওয়ায় মুসলিম নেতৃবৃন্দ তা বর্জন করেন। নেহেরু রিপোর্টের প্রতিবাদে ১৯২৯ সালে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর চৌদ্দ দফা দাবি পেশ করেন। এমনই এক পরিস্থিতিতে, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে গান্ধীর নেতৃত্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩২) শুরু হয়। এমতাবস্থায়, ব্রিটিশ সরকার ভারতের রাজনৈতিক সংকট ও শাসনতান্ত্রিক রূপরেখা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করে। এ বৈঠক ১৯৩০ সালে শুরু হয়ে তিন দফায় ১৯৩২ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে চূড়ান্ত সমঝোতার সম্ভাবনা না দেখে ১৯৩২ সালের ১৭ আগস্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড একটি সমাধান প্রদান করেন। এতে তিনি আইনসভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বণ্টনসহ ভারতের জন্য একটি ভবিষ্যত সংবিধানের রূপরেখা প্রণয়ন করেন। এটি ম্যাকডোনাল্ডের 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' নামে পরিচিত। এই ধারাবাহিকতাতে ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নতুন ভারত শাসন আইন পাশ হয়।

বৈশিষ্ট্য :

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

১. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ব্রিটিশ ভারতের সকল প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ নিয়ে একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়।

২. এ আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট করা হয়। এর উচ্চকক্ষটি রাজ্যসভা (Council of state) ও নিম্নকক্ষটি ব্যবস্থাপক পরিষদ (House of Assembly) বলে অভিহিত হবে। উচ্চকক্ষের সর্বমোট প্রতিনিধি হবেন ২৬০ জন এবং নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যা হবে ৩৭৫ জন।

৩. এ আইনের মাধ্যমে শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয় যথা: কেন্দ্রীয় বিষয়, প্রাদেশিক বিষয় ও যুগ্ম বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়সমূহ যথা: দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, মুদ্রা, আয়কর, যোগাযোগ, তথ্যদপ্তর প্রভৃতি ন্যস্ত করা হয়। অপরদিকে, প্রাদেশিক সরকারের হাতে প্রাদেশিক বিষয়াবলী যথা– আইনশৃংখলা, পুলিশ, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রভৃতি বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। এছাড়া যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়সমূহ যথা– ফৌজদারি আইন, বিচার প্রণালী, উইল প্রভৃতি কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয় সরকারের এখতিয়ারভূক্ত রাখা হয়।

৪. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রদেশে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করে। প্রাদেশিক বিষয়সমূহের উপর প্রদেশের কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয় এবং প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাকে আইনসভার নিকট জবাবদিহি করার বিধান করা হয়।

৫. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা চালু করে। গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর নির্বাহী পরিষদের নিকট প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, ধর্মীয় বিষয়, উপজাতি প্রভৃতি বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। অপরদিকে অন্যান্য বিষয়াবলী গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত করা হয়।

৬. এ আইনে ভারতবর্ষের জন্য একটি ফেডারেল কোর্ট বা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়। একজন প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি নিয়ে তা গঠিত হবে।

৭. এ আইন দ্বারা সিন্ধু ও উড়িষ্যা নামে দুটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়।

৮. মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ও সংখ্যা অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্ব অব্যাহত রাখা হয়।

৯. এই আইনে বার্মাকে (বর্তমান মায়ানমার) ভারতবর্ষ থেকে পৃথক করা হয়।

১০. এ আইনের মাধ্যমে ভোটদানকে উৎসাহিত করা হয় এবং ভোটার হবার যোগ্যতা শিথিল করা হয়।

১১. এ আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দ রাখা হয়।

১২. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের যেকোন প্রকার সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিমার্জনের ক্ষমতা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে রাখা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ এর তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ আইনের মাধ্যমে প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়। তাছাড়া এ আইনের মাধ্যমে ভারতীয়রা অধিক মাত্রায় প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হবার সুযোগ পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বিশেষ দিক কোনটি?
(ক) যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন (খ) যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা (গ) স্বায়ত্তশাসন (ঘ) ভারত বিভক্তি

২। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশরা প্রশমিত করতে চেয়েছিল–
i. ব্রিটিশদের প্রতি ভারতীয়দের অসন্তোষ
ii. ব্রিটিশদের প্রতি হিন্দুদের ক্ষোভ
iii. হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দূরত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। ভারত শাসন আইনে ভারতীয় উপদেষ্টামণ্ডলী রহিত করার সাথে কোনটি জড়িত?
(ক) ভারত সচিব (খ) রাজ প্রতিনিধি (গ) উপদেষ্টা সংখ্যা (ঘ) ভারতীয় প্রতিনিধি

পাঠ-১.১৪ বঙ্গীয় আইনসভা, ১৯৩৭

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রথম বঙ্গীয় আইনসভা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- এ আইনসভার গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আইনসভা, মন্ত্রিসভা, কোয়ালিশন, কৃষক, প্রজা, কৃষিখাতক, ঋণ সালিশী বোর্ড, চাকরি নিয়োগ বিধি।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রদেশে স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন করে। এ ছাড়া এ আইনে ভোটাধিকার ও আইনসভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ফলশ্রুতিতে প্রাদেশিক পর্যায়ের নির্বাচন এবং সরকার গঠনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ সময় বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম নেতৃত্বের উত্থান ঘটে। ব্রিটিশ শাসনের শেষ দশকে (১৯৩৭-১৯৪৭) বাংলায় চারটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এগুলো ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-৪১), ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা (১৯৪১-৪৩), নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভা (১৯৪৩-৪৫) ও সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা (১৯৪৬-৪৭)।

প্রথম বঙ্গীয় আইনসভা বা ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে বাংলায় মুসলমানদের জন্য বরাদ্দকৃত ১১৭টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ৪০টি, ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টি ৩৫টি এবং স্বতন্ত্র মুসলিম প্রার্থীরা ৪২টি আসন লাভ করে। কোনো দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা না থাকায় কোয়ালিশন সরকার গঠন অনিবার্য হয়ে ওঠে। সাধারণ আসনের নির্বাচনে কংগ্রেস ৫৪টি আসন পায়। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও কংগ্রেস সরকার গঠনে অসম্মতি জানায়। এমতাবস্থায়, কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হকের ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা বিবেচনায় নিয়ে ফজলুল হককে সরকার গঠনের আহ্বান জানানো হয়।

ফজলুল হক প্রথমে কংগ্রেসের সাথে মন্ত্রিসভা গঠনের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সে উদ্যোগ সফল হয়নি। এরপর তিনি মুসলিম লীগকে নিয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রজা-লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে ৬ জন মুসলমান ও ৫ জন হিন্দু ছিলেন। এদের মধ্যে ৬ জন জমিদার, ১ জন পুঁজিপতি এবং ৪ জন আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ ছিলেন।

গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

প্রথম বঙ্গীয় আইনসভা বাংলার কৃষক ও বাঙালি শিক্ষিত মুসলমানদের স্বার্থে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল–

১. বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৩৮

এ আইনের মাধ্যমে জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত ফি, জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে জমিদারদের প্রাধান্য, সার্টিফিকেট প্রথার মাধ্যমে খাজনা আদায় এবং সাধারণ চাষীদের কাছ থেকে বিভিন্ন অবৈধ আদায় প্রভৃতি বাতিল করা হয়। তাছাড়া এই আইনে বকেয়া খাজনার উপর ধার্যকৃত সুদের হার ১২.৫% থেকে কমিয়ে ৬.২৫% করা হয়।

২. কৃষি-খাতক আইন, ১৯৩৮

এই আইনের মাধ্যমে সমগ্র প্রদেশে অসংখ্য ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করা হয়।

৩. মহাজনি আইন, ১৯৪০

বঙ্গীয় মহাজনি আইনের মাধ্যমে সকল মহাজনের ট্রেড লাইসেন্স থাকা বাধ্যতামূলক করা হয় এবং সুদের হার স্থির করে দেয়া হয়।

৪. বঙ্গীয় চাকরি নিয়োগ বিধি বা সম্প্রদায় ভিত্তিক বণ্টন বিধি, ১৯৩৯
এই আইনের মাধ্যমে বাংলায় শিক্ষিত মুসলমানরা সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়। এর মাধ্যমে শতকরা ৫০ ভাগ চাকরি মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয় এবং নিয়োগ নীতি তদারকির জন্য একজন কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বঙ্গীয় আইন সভার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

প্রথম বঙ্গীয় আইন সভাকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হতে হয়। সকল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে না পারলেও এ আইনসভা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। বকেয়া খাজনার উপর ধার্যকৃত কর হ্রাস, ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন, চাকরির নিয়োগ বিধি উল্লেখযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ব্রিটিশ শাসন আমলে বাংলায় কয়টি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়?
(ক) ২টি (খ) ৩ টি
(গ) ৪ টি (ঘ) ৫ টি

২। বঙ্গীয় আইন সভার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল-
i. কৃষি-খাতক আইন, ১৯৩৮
ii. মহাজনী আইন, ১৯৪০
iii. বঙ্গীয় চাকরি নিয়োগ বিধি, ১৯৩৯
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.১৫ লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- লাহোর প্রস্তাবের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ।
- লাহোর প্রস্তাবের মূল ধারাগুলো আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	দ্বিজাতি তত্ত্ব, সাম্প্রদায়িক, একদর্শী নীতি, পাকিস্তান প্রস্তাব, বার্ষিক অধিবেশন।

ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ প্রস্তাব মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। বস্তুত: লাহোর প্রস্তাব ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে মুসলিম লীগ পরিচালিত আন্দোলনের পরিণতিতে ভারতবর্ষ ভাগ হয়।

প্রেক্ষাপট

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৩৭ সালে প্রদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রাদেশিক নির্বাচনে অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস জয়লাভ করে। এমনকি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশেও কংগ্রেস জয়লাভ করে। মুসলিম লীগের পরাজয় মুসলিম নেতৃবৃন্দকে শংকিত করে তোলে। এমন এক বাস্তবতাতে, ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের সাধারণ অধিবেশন আহবান করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজণিত বাস্তবতা, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ ছাড়াই ভারত সরকারের যুদ্ধে যোগদান এবং ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতেও মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ পর্যালোচনাই ছিল অধিবেশনের উদ্দেশ্য। এই অধিবেশনে মুসলিম লীগের নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী মনোভাব সম্পন্ন মুসলিম নেতাদের তীব্র সমালোচনার কারণে তিনি ধর্মভিত্তিক জাতির ধারণাকে সামনে তুলে ধরে, হিন্দু-মুসলিমদের দুটি জাতি হিসাবে দাবী করেন। জিন্নাহর সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতি তত্ত্ব এবং মুসলিমদেও জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবী, এক পর্যায়ে লাহোরে অনুষ্ঠিত উপরোক্ত অধিবেশনের মূল সুর হয়ে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক একটি প্রস্তাব পেশ করেন। জিন্নাহর সভাপতিত্বে প্রস্তাবটি সভায় গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত।

বৈশিষ্ট্য

লাহোর প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন বা সন্নিহিত স্থানসমূহকে পৃথক অঞ্চল হিসেবে গণ্য করতে হবে।

২. ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে হবে।

৩. এসব স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে প্রয়োজনবোধে ভারতবর্ষের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোর সীমানা পুন:নির্ধারণ করতে হবে।

৪. এসব স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যসমূহ হবে সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত।

৫. ভারতের ও নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬. পরবর্তীতে দেশের যেকোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় উক্ত বিষয়গুলোকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

ফলাফল ও তাৎপর্য

লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি ছিল দ্বিজাতি তত্ত্ব। এ প্রস্তাবের কোথাও পাকিস্তান শব্দটি ছিল না। তথাপি এ প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ প্রস্তাব ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পৃথক আবাসভূমির স্বপ্ন বপন করে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ লাহোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

লাহোর প্রস্তাব মুসলিম লীগকে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ভারতের মুসলিমদের পক্ষে জনমত তৈরি হতে থাকে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের ফলাফল এর প্রমাণ।

১৯৪৬ সালে জিন্নাহর নেতৃত্বে দিল্লি মুসলিম লেজিসলেটরস কনভেনশন এ মুসলমানদের একাধিক রাষ্ট্র পরিচালনাকে বাদ দিয়ে এক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। এটি ছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। তথাপি, ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত বিভক্ত হয়ে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল নিয়ে সৃষ্টি হয় পাকিস্তান এবং বাকি অংশ নিয়ে গঠিত হয় ভারত।

শিক্ষার্থীর কাজ	লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি কী ছিল?

সারসংক্ষেপ

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম মূলভিত্তি হিসেবে পরিগণিত। এ প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারতের মুসলমানদের জন্য একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়। পরবর্তীতে জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য একটি তথা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক কত সালে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন?

(ক) ১৯০৫ সালে (খ) ১৯৩৫ সালে

(গ) ১৯৪০ সালে (ঘ) ১৯৪৭ সালে

২। লাহোর প্রস্তাবে মুসলিমদের জন্য কয়টি রাষ্ট্রের দাবি করা হয়েছিল?

(ক) একটি (খ) দুটি

(গ) একাধিক (ঘ) কোনটি নয়

৩। দ্বিজাতি তত্ত্বের মূল কথা কি?

(ক) হিন্দু-মুসলিম একজাতি (খ) হিন্দু-মুসলিম দুই জাতি

(গ) সর্ব ভারতীয় এক জাতি (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-১.১৬ ক্রিপস মিশন ও মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ক্রিপস মিশন ও মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাজনৈতিক সংকট, খসড়া প্রস্তাব, যুক্তরাষ্ট্র, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কালো দিবস

পটভূমি

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ক্রিপস মিশন এবং মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ক্রিপস মিশন যখন কাজ শুরু করে তখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পরস্পর বিরোধী অবস্থানে ছিল। বিশ্ব রাজনীতি তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইস্যুতে দ্বিধা বিভক্ত। এমন এক পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের প্রভাবশালী মন্ত্রি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এর নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধিদল ভারতের রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য ১৯৪২ সালের ২৯ মার্চ একটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করে। স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এর নামানুসারে এ মিশনের নাম হয় ক্রিপস মিশন।

ক্রিপস মিশন এর প্রস্তাবনায় ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং একটি ডোমিনিয়নের মর্যাদার জন্য সুপারিশ করা হয়। তাছাড়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে সংবিধান প্রণয়নের জন্য গণপরিষদ গঠন, অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন বিষয়েও সুপারিশ করা হয়।

কিন্তু ক্রিপস মিশনের প্রস্তাব মুসলিম লীগ প্রত্যাখ্যান করে। ফলে এ মিশন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।

পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ব্রিটিশ সরকার আবারো ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমধানে উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাছাড়া, ব্রিটেনে শ্রমিক দলের নতুন সরকার ভারতীয়দের স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায় তিনজন প্রভাবশালী মন্ত্রি নিয়ে গঠিত একটি মিশন সিমলাতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় বসে। এরা হলেন ভারতসচিব লর্ড প্যাথিক লরেন্স, বাণিজ্যবোর্ডের সভাপতি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং রাজকীয় নৌ বাহিনীর প্রথম লর্ড এ.ভি. আলেকজান্ডার।

এ মিশন ১৯৪৬ সালের ১৬ মে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা পেশ করে। এ প্রস্তাবনা মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা নামে পরিচিত।

বৈশিষ্ট্য

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলো স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদী এ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। নিম্নে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হল–

১. মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলোর সমন্বয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়। প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও বৈদেশিক সম্পর্ক এ তিনটি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রাধীন রাখা হয়।

২. কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাভুক্ত বিষয় ছাড়া শাসন সংক্রান্ত অন্যান্য সকল বিষয়ের উপর প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্য সরকারের কর্তৃত্ব থাকবে।

৩. ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভা ও শাসন বিভাগ গঠিত হবে।

৪. কেন্দ্রীয় আইনসভায় কোনো সম্প্রদায়ের মৌলিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে ঐ সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হবে।

৫. ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করা হবে। যথা–

'ক' গ্রুপ- এ গ্রুপে থাকবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছয়টি প্রদেশ যথা- মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশ।

'খ' গ্রুপ- এ গ্রুপে থাকবে উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ তিনটি প্রদেশ যথা- সিন্ধু, পাঞ্জার ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।

'গ' গ্রুপ- এ গ্রুপে থাকবে পূর্ব ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দু'টি প্রদেশ যথা– বাংলা ও আসাম।

প্রতিটি গ্রুপ স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়সমূহ ছাড়া পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জন করবে।

৬. প্রাদেশিক পর্যায়ে প্রতিটি গ্রুপের আলাদা শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ থাকবে।

৭. ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য প্রতিটি গ্রুপের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়।

৮. কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক গ্রুপের শাসনতন্ত্রে এমন শর্ত থাকতে হবে যেন দশ বছর পর যেকোন প্রদেশ সংবিধানের শর্তাবলী পুনর্বিবেচনা করতে পারে।

৯. যেকোন প্রদেশে সংবিধান রচিত হবার পর সংশ্লিষ্ট গ্রুপ থেকে বের হয়ে আসতে পারবে।

১০. এ পরিকল্পনায় ভারতের জন্য নতুন সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে।

১১. প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পর দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর থেকে ব্রিটিশ সার্বভৌম ক্ষমতার অবসান হবে।

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার পরিণতি

মুসলীম লীগ মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করলেও কংগ্রেস মিশনের অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন ও বাধ্যতামূলক গ্রুপিং ব্যবস্থাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এমতাবস্থায়, ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৬ সালের ২৬ জুন নিজেদের মনোনীত সদস্যদের নিয়ে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ঘোষণা দেয়। এ ঘোষণায় মুসলিম লীগ মর্মাহত হয় এবং ব্রিটিশ সরকারকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করে। পাকিস্তান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' ডাক দেয়। ইতিমধ্যে কংগ্রেস অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব মেনে নিলেও, মুসলিম লীগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' কর্মসূচিতে অনড় থাকে। এমতাবস্থায় কলকাতায় ১৬ আগস্ট এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এর মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৬ সালের ২৪ আগস্ট কংগ্রেসের নেতৃত্বে শাসন পরিষদ গঠন করে যার প্রতিবাদস্বরূপ মুসলিম লীগ ১ সেপ্টেম্বর 'কালো দিবস' পালন করে। এ সময় উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাড়তে থাকে। এক সময় মুসলিম লীগ অন্তবর্তীকালীন সরকারে যোগদানে সম্মতি জানায়। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পরস্পর বিরোধী অবস্থান দিন দিন বাড়তেই থাকে। ফলে, অচিরেই মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হল কেন?

সারসংক্ষেপ

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে একটি শিথিল বন্ধনীর মাধ্যমে যুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ মিশন ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের পরস্পর বিরোধী স্বার্থের সমন্বয় করতে ব্যর্থ হয়। ফলশ্রুতিতে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব হয় নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ক্রিপস মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় কেন?

(ক) কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করায় (খ) মুসলিম লীগ গ্রহণ করায়

(গ) ব্রিটিশরা প্রত্যাখ্যান করায় (ঘ) রাণীর অনুমোদন না পাওয়ায়

২। মন্ত্রিপরিষদ পরিকল্পনা পেশ করা হয় কত সালে?

(ক) ১৯৪৪ সালে (খ) ১৯৪৬ সালে

(গ) ১৯৪৭ সালে (ঘ) ১৯৪৮ সালে

৩। মন্ত্রিমিশনের সদস্য ছিলেন-

i. স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস

ii. লর্ড মাউন্টব্যাটেন

iii. লর্ড প্যাথিক লরেন্স

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.১৭ ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭ এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করতে পারবেন।
- ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের ফলাফল ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ক্ষমতা হস্তান্তর, স্বাধীনতা আইন, ডোমিনিয়ন গণপরিষদ, কমনওয়েলথ, স্বাধীন রাষ্ট্র।

পটভূমি

ব্রিটিশরা তাদের 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির মাধ্যমে ভারতবর্ষে তাদের শাসন প্রলম্বিত করলেও, শেষ পর্যন্ত তারা ঐক্যবদ্ধ ভারতের পক্ষে ছিল যার প্রমাণ ছিল মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পরস্পর বিরোধী অবস্থান এ পরিকল্পনাকে অকার্যকর করে দেয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাড়তে থাকে। উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানকল্পে ব্রিটিশ সরকার স্থায়ীভাবে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবার ঘোষণা দেয়। ব্রিটিশ ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন একটি পরিকল্পনা ঘোষিত হয়। এ পরিকল্পনার আলোকে ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাস হয়। এই আইন অনুযায়ী ভারতবর্ষে প্রায় ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে।

বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭ এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১. এ আইনের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। উভয় রাষ্ট্র ডোমিনিয়নের মর্যাদা লাভ করে।

২. এ আইনে বৃহৎ দু'টি প্রদেশ বাংলা ও পাঞ্জাবকে হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে বিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়।

৩. এ আইন অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তান নিজ নিজ গণপরিষদ গঠন করবে এবং তাদের কাছে সংবিধান রচনার ক্ষমতা দেয়া হয়। আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, সংবিধান রচনার পূর্ব পর্যন্ত এই দুই পরিষদ নিজ নিজ দেশের সার্বভৌম কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ রূপে কাজ করবে।

৪. এ আইনের মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত থাকবে কিনা সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়।

৫. ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ভারত সচিব পদ বিলুপ্ত করে।

৬. এ আইনের মাধ্যমে দেশীয় রাজ্যগুলোর হাতে নিজ অবস্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়।

৭. এ আইনে ভারত সচিব কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীগণকে ভারত ও পাকিস্তানের অধীনে চাকুরি করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দেয়া হয়।

৮. ভারত ও পাকিস্তানের গণপরিষদ কর্তৃক নিজ নিজ দেশের সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত নিম্নলিখিত সংশোধন ও পরিবর্তন সাপেক্ষে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার পরিচালিত হবে।

   (ক) মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নর তাদের সকল প্রকার কাজ পরিচালনা করবেন।

(খ) স্ব স্ব ডোমিনিয়নের মন্ত্রি পরিষদের পরামর্শক্রমে ব্রিটিশ রাজ গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করবেন।

(গ) মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত করবেন।

ফলাফল ও তাৎপর্য :

১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বশেষ পদক্ষেপ। এর মাধ্যমেই ভারতের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। পৃথিবীর মানচিত্রে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামক দু'টি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। অবসান হয় ভারতীয় উপমহাদেশে সুদীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনের। যদিও মহাত্মা গান্ধী অবিভক্ত ভারতের জন্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর দলের কিছু সদস্যের অনমনীয় মনোভাবের কারণে তিনি পূর্বের অবস্থান হতে সরে আসেন। এ আইনে মূল লাহোর প্রস্তাবকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলশ্রুতিতে ভারত বিভক্তি এ অঞ্চলে স্থায়ী সমাধান দিতে পারেনি। পরবর্তীকালে পুনরায় পাকিস্তানের বিভক্তি ঘটে এবং অভ্যুদয় হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের গুরুত্ব লিখুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে দীর্ঘ ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। সৃষ্টি হয় দু'টি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র- ভারত ও পাকিস্তান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাস্তবতাতে ভারতবর্ষেও ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্রিটিশরা ভিন্নভাবে চিন্তা করতে শুরু করে। তাছাড়া ভারতবর্ষে রাজনৈতিক পরিস্থিতিও অনেকটা ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল। এমতাবস্থাতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের উপায় হিসেবে লর্ড মাউন্টব্যাটন ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন ঘোষণা করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন পরিকল্পনায় ভারতীয় স্বাধীনতা আইন বাস্তবরূপ পায়?

(ক) মন্ত্রিপরিষদ পরিকল্পনা (খ) ৩ জুন পরিকল্পনা

(গ) ভারত পরিকল্পনা (ঘ) ক্রিপস পরিকল্পনা

২। ভারতের সর্বশেষ ইংরেজ গভর্নর জেনারেল কে?

(ক) লর্ড মিন্টো (খ) লর্ড কার্জন

(গ) লর্ড মাউন্টব্যাটেন (ঘ) লর্ড লিটন

৩। ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের ফলাফল-

i. ইংরেজ শাসনের অবসান

ii. মুসলিম শাসনের পুনর্জাগরণ

iii. ভারত বিভক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.১৮ স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের ব্যর্থতার কারণ আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অখণ্ড বাংলা, হিন্দু মহাসভা, ভারতীয় ইউনিয়ন, ফর্মূলা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সর্বভারতীয়।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্তির প্রাক্কালে অবিভক্ত বাংলায় সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর বড় ভাই শরৎচন্দ্র বসু এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা 'স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র' গঠনের উদ্যোগ নেন। এ প্রচেষ্টা সফল হলে ১৯৪৭ সালেই বাংলা ভারতবর্ষে তৃতীয় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হত।

পটভূমি

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার পর ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবল অস্থিরতা ও নৈরাজ্য দেখা দেয়। অপরদিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে, বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় উপনিবেশিক শাসনের অবসান অবধারিত হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে, ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড এটলি ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন। এ ঘোষণায় ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল। এমতাবস্থায়, হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন, হিন্দু মহাসভা বাংলাকে বিভক্ত করে হিন্দু প্রধান অঞ্চল দিয়ে পশ্চিম বাংলা প্রদেশ গঠন এবং একে ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে যুক্ত করার আন্দোলন শুরু করে। কংগ্রেসও এ আন্দোলনকে সমর্থন করে। এছাড়া এই সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে জিন্নাহর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও তুঙ্গে। এমন এক পরিস্থিতিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় অবিভক্ত বাংলার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি আবুল হাশিম, শরৎচন্দ্র বসু এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সংসদীয় দলের নেতা কিরণ শংকর রায় এ উদ্যোগের প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৯৪৭ সালের ২০ মে শরৎ বসুর কলকাতাস্থ বাড়িতে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার সমর্থক উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালি নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ–

১. বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। ভারতের অন্যান্য অংশের সাথে কি সম্পর্ক হবে বাংলা তা নিজে নির্ধারণ করবে।

২. স্বাধীন বাংলায় শাসনতন্ত্রে হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যা অনুপাতে আসন সংরক্ষণসহ যুক্ত নির্বাচন এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইনসভা নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে।

৩. ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করবে যে, স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং বাংলা বিভক্ত হবে না।

৪. নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইনসভা ও মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সামরিক বাহিনী ও পুলিশসহ অন্যান্য চাকরিতে সমান অংশ থাকবে।

৫. বাংলার আইনসভা ৩০ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংবিধান পরিষদ নির্বাচিত করবে যেখানে ১৬ জন মুসলমান ও ১৪ জন হিন্দু সদস্য থাকবেন।

ব্যর্থতার কারণ

স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের প্রতি বাংলার গভর্ণর স্যার ফ্রেডরিখ বারোস পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। একটা সময় পর্যন্ত এ উদ্যোগের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতা জিন্নাহর সমর্থন ছিল। কংগ্রেসের হাই কমাণ্ডের মধ্যে গান্ধী প্রথম দিকে এ উদ্যোগের প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করেন। তবে জওহরলাল নেহেরু ও বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রথম থেকেই এ উদ্যোগের ব্যাপারে ভেটো প্রদান করতে থাকে। কার্যত স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের ভাগ্য বাংলার বাইরে সর্বভারতীয় পর্যায়ে নির্ধারিত হয়।

তাছাড়া ভারত বিভক্তির পূর্বের গুরুত্বপূর্ণ এক দশক (১৯৩৭-৪৭) সময়কালে বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে মুসলমান নেতৃবৃন্দ মুখ্য ভুমিকায় চলে আসে। কোন কোন বিশ্লেষকের মতে, এ বিষয়টি বাংলার হিন্দু নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক ধরনের রাজনৈতিক হতাশা ও বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম দেয়। এ থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বাংলা বিভক্তির মানসিকতা দেখা দেয়। তাছাড়া, ১৯৪৬ সালে কলকাতা দাঙ্গার পর হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধ অবস্থান প্রায় দুরূহ হয়ে পড়ে। শুধু কংগ্রেস নয় বাংলায় মুসলিম লীগের একটি অংশও অখণ্ড বাংলায় বিরোধিতা করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ কেন ব্যর্থ হয়?

সারসংক্ষেপ

ভারতবর্ষ বিভক্তির প্রাক্কালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। মূলত কংগ্রেসের হাই কমাণ্ড ও মুসলিম লীগের গোঁড়া নেতাদের বিরোধীতায় এ উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের সাথে কোন ব্যক্তি জড়িত?

(ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (খ) শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক

(গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (ঘ) আবুল মনসুর আহমেদ

২। পল্লব স্যার শ্রেণিকক্ষে এমন একজন নেতার কথা বললেন, যিনি স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। তিনি কার কথা বলেছিলেন?

(ক) শরৎ বসু (খ) সুভাষ চন্দ্র বসু

(গ) কিরণ শঙ্কর রায় (ঘ) বল্লভ ভাই প্যাটেল

পাঠ-১.১৯ ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উপর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন।
- ব্রিটিশ শাসনের ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আমূল পরিবর্তন, বিমাতাসূলভ, নি:স্ব, পুঁজিপতি শ্রেণি, মধ্যবিত্ত শ্রেণি, রাজনীতি সচেতন, সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা, সমাজ কাঠামো, নতুন অর্থনীতি, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত

ভারতবর্ষে প্রায় দু'শ বছরের ব্রিটিশ শাসন ছিল খুবই ঘটনাবহুল ও তাৎপর্যপূর্ণ। এ শাসনের অভিঘাতে বাংলা তথা ভারতবর্ষের চিরায়ত প্রায় স্বনির্ভর ও স্বনিয়ন্ত্রিত গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা দ্রুত ভেঙ্গে পড়েছিল। রাজনৈতিক অঙ্গনেও এসেছিল আমূল পরিবর্তন। নিম্নে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল আলোচনা করা হল–

সামাজিক ব্যবস্থা

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় সমাজ কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। উপনিবেশিক শাসনের পরিনতিতে বাংলা তথা ভারতবর্ষের নাগরিকরা নিজ দেশে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা বেশি শোচনীয় হয়ে পড়ে বলে অনেকে মনে করেন। বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকে মুসলমানরা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে।

ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত, বিধবা বিবাহ চালু, বাল্য বিবাহ রোধ, আলীগড় আন্দোলন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পরিবর্তন আসে বর্ণ প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠা সামাজিক স্তর বিন্যাসে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। ইংরেজি শিক্ষা, পুঁজিবাদের প্রসার ও নতুন রাজনৈতিক কাঠামোর কারণে বাংলার সামাজিক অবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। অনেকে দাবী করেন যে, ব্রিটিশরাই ঔপনিবেশিক শাসন প্রলম্বিত করার জন্য সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ বপন করে। এ বিভেদ নীতির কারণে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় মুখোমুখি অবস্থানে চলে যায়। ব্রিটিশদের রোপিত সাম্প্রদায়িকতার বীজ পরবর্তীতে বিশাল মহীরূহে পরিণত হয় যার ফলস্বরূপ শুধু বাংলা প্রদেশের বিভক্তি হয়নি, বিভক্ত হয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশও।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগণ নিজেদের শাসন ও শোষণের অনুকূলে এক নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব করেন। এ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল সম্পদ লুণ্ঠন ও রাজস্ব সংগ্রহ। ব্রিটিশ প্রবর্তিত ভূমি বন্দোবস্ত প্রথা, চিরস্থায়ী ব্যবস্থা, ভূমির মালিকানা স্বত্ব প্রদান, কর আরোপ ও আদায়ের নতুন-নতুন রীতি-নীতি বাংলার অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। ব্রিটিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা নতুন জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির জন্ম দেয়। ব্রিটিশ শাসকদের পাশাপাশি দু'শ্রেণির শোষণ ও নিপীড়ন বাংলার কৃষক ও কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়। জোরপূর্বক চালুকৃত নীল চাষ একদিকে যেমন জমির উৎপাদন হ্রাস করে, তেমনি কৃষকদেরকে স্বোপার্জিত অর্থনীতি থেকে উৎখাত করে।

ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে বাংলার স্থানীয় শিল্প-কারখানা, কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। ব্রিটিশ শাসকরা বাংলাকে শিল্পের কাঁচামালের যোগানদাতা হিসেবে ব্যবহার করে। আবার বাংলার কাঁচামাল থেকে তৈরী জিনিসের বাজার হিসেবে ব্যবহার করে এই ভারতবর্ষকেই। ব্রিটিশ প্রবর্তিত অর্থনীতিতে বাংলায় পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে, আর এই পুঁজিপতি শ্রেণিই বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতবর্ষে সমাজ-সংস্কৃতি, জীবন-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতি জায়গায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে, যার ছোঁয়া লাগে রাজনৈতিক অঙ্গনেও। ঔপনিবেশিক শাসনের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হল, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার অভূতপূর্ব প্রসার। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এক পর্যায় এসে গণতন্ত্র, রাজনৈতিক অধিকার, স্বাধিকার, জাতীয়তাবাদ এ সমস্ত তত্ত্বের সাথে পরিচিতি লাভ করে। এর ফলে প্রথমে দাবি ওঠে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশীদারিত্বের, পরবর্তীতে তা ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করে স্বশাসনের দাবিতে পরিণত হয়।

ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৮৫ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে জন্ম লাভ করে প্রথম রাজনৈতিক দল 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'। ১৯০৬ সালে জন্ম লাভ করে 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ'। এ দু'টি রাজনৈতিক দল ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বাস্তবিক রূপ দেয়।

ব্রিটিশ শাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ১৮৬১ সাল থেকে শুরু করে গৃহিত বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার। যার মাধ্যমে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য ধারার সংসদীয় শাসনব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্রিটিশ শাসনের দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বাংলার সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। উপনিবেশিক শাসন বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করেছিল। আবার এই শাসনের মধ্যেই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে উদ্ভব ঘটে মধ্যবিত্ত শ্রেণির। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে ভাগ করে ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর নামে দুটি পৃথক সিটি কর্পোরেশন করা হয়। বর্তমানে কর্পোরেশন দুটিতে দুজন নির্বাচিত মেয়রের নেতৃত্বে পৃথক পরিষদ পরিচালিত হচ্ছে।

১। উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে ব্রিটিশ ভারতের কোন ঘটনার দূরবর্তী মিল আছে?

(ক) বঙ্গভঙ্গ (খ) ভারত বিভক্তি
(গ) স্বদেশি আন্দোলন (ঘ) খিলাফত আন্দোলন

২। উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে মিলে যাওয়া ব্রিটিশ ভারতের ঐতিহাসি ঘটনার ফলে

i. জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বাধাগ্রস্ত হয়
ii. সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়
iii. শাসকদের প্রতি মানুষের আস্থা বাড়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল রচনামূলক

১। একটি দেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত 'ক' ইউনিয়নটি আয়তনে অনেক বড় এবং জনসংখ্যাও বিপুল। একজন চেয়ারম্যানের পক্ষে এত বড় ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। ইউনিয়নের এক বিশাল জনগোষ্ঠী পৃথক ইউনিয়ন গঠনের দাবি জানায়। কর্তৃপক্ষ তাতে সাড়া দিয়ে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে ইউনিয়নটিকে বিভক্ত করে দুটি ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(ক) পলাশীর যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়?

(খ) সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণটি ব্যাখ্যা করুন।

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে ঐতিহাসিক কোন বিষয়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে পাঠ্য বইয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাটির ফলাফল মূল্যায়ন করুন।

২। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতের প্রথম রাজনৈতিক দল ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। দলটি ব্রিটিশ সরকারের কাছে এ অঞ্চলের মানুষের দাবি তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিল। এতদসত্ত্বেও মুসলমানদের স্বতন্ত্র কোন রাজনৈতিক দল না থাকায় তাঁরা পশ্চাৎপদ অবস্থানে ছিল। ফলশ্রুতিতে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯০৬ সালে উপমহাদেশের দ্বিতীয় রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়।

(ক) বঙ্গভঙ্গ কখন সংঘটিত হয়?

(খ) দ্বিজাতি তত্ত্ব কী?

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম রাজনৈতিক দলটির প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

(ঘ) 'উদ্দীপকের দ্বিতীয় রাজনৈতিক দলটি মুসলিম জাতীয়তাবাদকে বিকশিত করে– মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১ ঃ ১। ক ২। গ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২ ঃ ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩ ঃ ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৭ ঃ ১। খ ২। খ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৮ ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৯ ঃ ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১০ ঃ ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১১ ঃ ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১২ ঃ ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৩ ঃ ১। গ ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৪ ঃ ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৫ ঃ ১। গ ২। গ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৬ ঃ ১। ক ২। খ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৭ ঃ ১। খ ২। গ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৮ ঃ ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৯ ঃ ১। ক ২। খ